আশ শূরা

৪২

নামকরণ

৩৮ আয়াতের وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ আয়াতাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। এ নামের তাৎপর্য হলো, এটি সেই সূরা যার মধ্যে শূরা শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা থেকে এ সূরার নাযিল হওয়ার সময় কাল জানা যায়নি। তবে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট জানা যায়, সূরাটি حٰمٓ السجدة সূরা নাযিল হওয়ার পরপরই নাযিল হয়েছে। কারণ, এ সূরাটিকে সূরা হা–মীম আস সাজদার এক রকম সম্পূরক বলে মনে হয়। যে ব্যক্তিই মনযোগ সহকারে প্রথমে সূরা হা–মীম আস সাজদা পড়বে এবং তারপর এ সূরা পাঠ করবে সে–ই এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবে।

সে দেখবে এ সূরাটিতে কুরাইশ নেতাদের অন্ধ ও অযৌক্তিক বিরোধিতার ওপর বড় মোক্ষম আঘাত হানা হয়েছিল। এভাবে পবিত্র মক্কা ও তার আশেপাশের এলাকায় অবস্থানকারী যাদের মধ্যেই নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও যুক্তিবাদিতার কোন অনুভূতি আছে তারা জানতে পরবে জাতির উচ্চস্তরের লোকেরা কেমন অন্যায়ভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করছে আর তাদের মোকাবিলায় তাঁর কথা কত ভারসাম্যপূর্ণ, ভূমিকা কত যুক্তিসঙ্গত এবং আচার–আচরণ কত ভদ্র। ঐ সতর্কীকরণের পরপরই এ সূরা নাযিল করা হয়েছে। ফলে এটি যথাযথভাবে দিক নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছে এবং একান্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলনের বাস্তবতা বুঝিয়ে দিয়েছে। কাজেই যার মধ্যেই সত্য প্রীতির কিছুমাত্র উপকরণ আছে এবং জাহেলিয়াতের গোমরাহীর প্রেমে যে ব্যক্তি একেবারে অন্ধ হয়ে যায়নি তার পক্ষে এর প্রভাবমুক্ত থাকা ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

কথা শুরু করা হয়েছে এভাবে ঃ তোমরা আমার নবীর পেশকৃত বক্তব্য শুনে এ কেমন আজেবাজে কথা বলে বেড়াচ্ছ? কোন ব্যক্তির কাছে অহী আসা এবং তাকে মানব জাতির পথপ্রদর্শনের হিদায়াত বা পথনির্দেশনা দেয়া কোন নতুন বা অদ্ভুত কথা নয় কিংবা কোন অগ্রহণযোগ্য ঘটনাও নয় যে, ইতিহাসে এই বারই সর্বপ্রথম এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এর আগে আল্লাহ নবী–রসূলদের কাছে এ রকম দিক নির্দেশনা দিয়ে একের পর এক অনুরূপ অহী পাঠিয়েছেন। আসমান ও যমীনের অধিকর্তাকে উপাস্য ও শাসক মেনে নেয়া অদ্ভুত ও অভিনব কথা নয়। তাঁর বান্দা হয়ে, তাঁর খোদায়ীর অধীনে বাস করে অন্য

কারো খোদায়ী মেনে নেয়াটাই বরং অদ্ভুত ও অভিনব ব্যাপার। তোমরা তাওহীদ পেশকারীর প্রতি ক্রোধান্বিত হচ্ছো। অথচ বিশ্ব জাহানের মালিকের সাথে তোমরা যে শিরক করছো তা এমন মহা অপরাধ যে আকাশ যদি তাতে ভেঙ্গে পড়ে তাও অসম্ভব নয়। তোমাদের এই ধৃষ্টতা দেখে ফেরেশতারাও অবাক। তারা এই ভেবে সর্বক্ষণ ভীত সন্ত্রস্ত যে কি জানি কখন তোমাদের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসে।

এরপর মানুষকে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তিকে নবী হিসেবে নিয়োজিত করা এবং সেই ব্যক্তির নিজেকে নবী বলে পেশ করার অর্থ এ নয় যে, তাঁকে আল্লাহর সৃষ্টির ভাগ্য বিধাতা বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সেই দাবী নিয়েই সে মাঠে নেমেছে। সবার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ নিজের হাতেই রেখেছেন। নবী এসেছেন শুধু গাফিলদের সাবধান এবং পথভ্রষ্টদের পথ দেখাতে। তাঁর কথা অমান্যকারীদের কাছে জবাবদিহি চাওয়া এবং তাদেরকে আযাব দেয়া বা না দেয়া আল্লাহর নিজের কাজ। নবীকে এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। তাই তোমাদের সমাজের তথাকথিত ধর্মীয় নেতা ও পীর ফকীররা যে ধরনের দাবী করে অর্থাৎ যে তাদের কথা মানবে না, কিংবা তাদের সাথে বে–আদবী করে তারা তাকে জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, নবী এ ধরনের কোন দাবী নিয়ে এসেছেন বলে মনে করে থাকলে সে ভ্রান্ত ধারণা মন–মগজ থেকে ঝেড়ে ফেলো। এ প্রসঙ্গে মানুষকে একথাও বলা হয়েছে যে, নবী তোমাদের অমঙ্গল কামনার জন্য আসেননি। তিনি বরং তোমাদের কল্যাণকামী। তোমরা যে পথে চলছো সে পথে তোমাদের নিজেদের ধ্বংস রয়েছে, তিনি শুধু এ বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করছেন।

অতপর আল্লাহ জন্মগতভাবে মানুষকে সুপথগামী করে কেন সৃষ্টি করেননি এবং মতানৈক্যের এই সুযোগ কেন রেখেছেন, যে কারণে মানুষ চিন্তা ও কর্মের যে কোন উল্টা বা সোজা পথে চলতে থাকে, এ বিষয়টির তাৎপর্য বুঝিয়েছেন। বলা হয়েছে, এ জিনিসের বদৌলতেই মানুষ যাতে আল্লাহর বিশেষ রহমত লাভ করতে পারে সে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। ইখতিয়ার বিহীন অন্যান্য সৃষ্টিকুলের জন্য এ সুযোগ নেই। এ সুযোগ আছে শুধু স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী সৃষ্টিকুলের জন্য যারা প্রকৃতিগতভাবে নয়, বরং জ্ঞানগত–ভাবে বুঝে শুনে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহকে নিজেদের অভিভাবক (PATRON, GUARDIAN) বানিয়েছে। যে মানুষ এই নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করার মাধ্যমে পথপ্রদর্শন করেন এবং সৎ কাজের তাওফীক দান করে তাঁর বিশেষ রহমতের মধ্যে শামিল করে নেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তার স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার ভুল পন্থায় ব্যবহার করে যারা প্রকৃত অভিভাবক নয় এবং হতেও পারে না তাদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা এই রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষের ও গোটা সৃষ্টিকুলের অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ। অন্যরা না প্রকৃত অভিভাবক, না আছে তাদের প্রকৃত অভিভাবকত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার ক্ষমতা। মানুষ তার স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার প্রয়োগ করে নিজের অভিভাবক নির্বাচনে ভুল করবে না এবং যে প্রকৃতই অবিভাবক তাকেই অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে। এর ওপরেই তার সফলতা নির্ভর করে।

তারপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীন পেশ করছেন তা প্রকৃতপক্ষে কি সে বিষয়ে বলা হয়েছে ঃ

সেই দীনের সর্বপ্রথম ভিত্তি হলো, আল্লাহ যেহেতু বিশ্ব জাহান ও মানুষের স্রষ্টা, মালিক এবং প্রকৃত অভিভাবক তাই মানুষের শাসনকর্তাও তিনি। মানুষকে দীন ও শরীয়ত (বিশ্বাস ও কর্মের আদর্শ) দান করা এবং মানুষের মধ্যেকার মতানৈক্য ও মতদ্বৈধতার ফায়সালা করে কোন্‌টি হক এবং কোন্‌টি নাহক তা বলে আল্লাহর অধিকারে অন্তর্ভুক্ত। অন্য কোন সত্তার মানুষের জন্য আইনদাতা ও রচয়িতা (Law giver) হওয়ার আদৌ কোন অধিকার নেই। অন্য কথায় প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্বের মত আইন প্রণয়নের সার্বভৌমত্বও আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। মানুষ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তা এই সার্বভৌমত্বের ধারক হতে পারে না। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর এই সার্বভৌমত্ব না মানে তাহলে তার আল্লাহর প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্ব মানা অর্থহীন। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য প্রথম থেকেই একটি দীন নির্ধারিত করেছেন।

সে দীন ছিল একটিই। প্রত্যেক যুগে সমস্ত নবী–রসূলকে ঐ দীনটিই দেয়া হতো। কোন নবীই স্বতন্ত্র কোন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন না। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য প্রথম দিন হতে ঐ দীনটিই নির্ধারিত হয়ে এসেছে এবং সমস্ত নবী–রসূল ছিলেন সেই দীনেরই অনুসারী ও আন্দোলনকারী।

শুধু মেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকার জন্য সে দীন পাঠানো হয়নি। বরং পৃথিবীতে সেই দীনই প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত থাকবে এবং যমীনে আল্লাহর দীন ছাড়া অন্যদের রচিত দীন যেন প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সবসময় এ উদ্দেশ্যেই তা পাঠানো হয়েছে। শুধু এ দীনের তাবলীগের জন্য নবী–রসূলগণ আদিষ্ট ছিলেন না, বরং কায়েম করার জন্য আদিষ্ট ছিলেন।

এটিই ছিল মানব জাতির মূল দীন। কিন্তু নবী–রসূলদের পরবর্তী যুগে স্বার্থান্বেষী মানুষেরা আত্মপ্রীতি, স্বেচ্ছাচার এবং আত্মম্ভরিতার কারণে স্বার্থের বশবর্তী হয়ে এ দীনের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি করে নতুন নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীতে যত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম দেখা যায় তার সবই ঐ একমাত্র দীনকে বিকৃত করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো তিনি যেন বহুবিধ পথ, কৃত্রিম ধর্মসমূহ এবং মানুষের রচিত দীনের পরিবর্তে সেই আসল দীন মানুষের সামনে পেশ করেন এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে তোমরা যদি আরো বিগড়ে যাও এবং সংঘাতের জন্য তৎপর হয়ে ওঠো তাহলে সেটা তোমাদের অজ্ঞতা। তোমাদের এই নির্বুদ্ধিতার কারণে নবী তাঁর কর্মতৎপরতা বন্ধ করে দেবেন না। তাঁকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আপনার ভূমিকায় অটল থাকেন এবং যে কাজের জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছেন তা সম্পাদন করেন। যেসব কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস এবং জাহেলী রীতিনীতি ও আচার–অনুষ্ঠান দ্বারা ইতিপূর্বে আল্লাহর দীনকে বিকৃত করা হয়েছে তিনি তোমাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দীনের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করবেন তোমরা তাঁর কাছে এ প্রত্যাশা করো না।

আল্লাহর দীন পরিত্যাগ করে অন্যদের রচিত দীন ও আইন গ্রহণ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে কত বড় ধৃষ্টতা সে অনুভূতি তোমাদের নেই। নিজেদের দৃষ্টিতে তোমরা একে দুনিয়ার সাধারণ ব্যাপার মনে করছো। তোমরা এতে কোন দোষ দেখতে পাও না। কিন্তু আল্লাহর

দৃষ্টিতে এটা জঘন্যতম শিরক এবং চরমতম অপরাধ। সেই সব লোককে এই শিরক ও অপরাধের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে যারা আল্লাহর যমীনে নিজেদের দীন চালু করেছে এবং যারা তাদের দীনের অনুসরণ ও আনুগত্য করেছে।

এভাবে দীনের একটি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করার পর বলা হয়েছে, তোমাদেরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য যেসব উত্তম পন্থা সম্ভব ছিল তা কাজে লাগানো হয়েছে। একদিকে আল্লাহ তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন। সে কিতাব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পন্থায় তোমাদের নিজের ভাষায় তোমাদের কাছে প্রকৃত সত্য পেশ করছে। অপর দিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী–সাথীদের জীবন তোমাদের সামনে বর্তমান, যা দেখে তোমরা জানতে পার এ কিতাবের দিক নির্দেশনায় কেমন মানুষ তৈরী হয়। এভাবেও যদি তোমরা হিদায়াত লাভ করতে না পার তাহলে দুনিয়ার আর কোন জিনিসই তোমাদেরকে সঠিক পথে আনতে সক্ষম নয়। কাজেই এখন এর ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে, তোমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যে গোমরাহীতে ডুবে আছো তার মধ্যেই ডুবে থাকো এবং এ রকম পথভ্রষ্টদের জন্য আল্লাহর কাছে যে পরিণতি নির্ধারিত আছে সেই পরিণতির মুখোমুখি হও।

এসব সত্য বর্ণনা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে সংক্ষেপে তাওহীদ ও আখেরাতের স্বপক্ষে যুক্তি–প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, দুনিয়া পূজার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে, আখেরাতের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে এবং কাফেরদের সেই সব নৈতিক দুর্বলতার সমালোচনা করা হয়েছে যা তাদের আখেরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মূল কারণ ছিল। তার পর বক্তব্যের সমাপ্তি পর্যায়ে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে ঃ

এক ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর কিতাব কি—এ ধারণার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন এবং ঈমান ও ঈমান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একেবারে অনবহিত ছিলেন। তারপর হঠাৎ এ দু'টি জিনিস নিয়ে তিনি মানুষের সামনে এলেন। এটা তাঁর নবী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

দুই ঃ তাঁর পেশকৃত শিক্ষাকে আল্লাহর শিক্ষা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ এ নয় যে, তিনি আল্লাহর সাথে সামনা সামনি কথাবার্তা বলার দাবীদার। আল্লাহর এই শিক্ষা অন্য সব নবী–রসূলদের মত তাঁকেও তিনটি উপায়ে দেয়া হয়েছে। এক–অহী, দুই–পর্দার আড়াল থেকে আওয়াজ দেয়া এবং তিন—ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গাম। এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যাতে বিরোধীরা এ অপবাদ আরোপ করতে না পারে যে, নবী (সা) আল্লাহর সাথে সামনা সামনি কথা বলার দাবী করছেন। সাথে সাথে ন্যায়বাদী মানুষেরা যেন জানতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে মানুষটিকে নবুওয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে তাঁকে কোন্ কোন্ উপায় ও পন্থায় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়।

حٰمٓ ﴿١﴾ عٓسٓقٓ ﴿٢﴾ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٤﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦﴾

হা মীম, আইন সীন ক্বাফ। মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময় আল্লাহ তোমার কাছে ও তোমার পূর্ববর্তীদের (রসূল) কাছে এভাবেই অহী পাঠিয়ে আসছেন।[১] আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তাঁর। তিনি সর্বোন্নত ও মহান।[২] আসমান ওপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়।[৩] ফেরেশতারা প্রশংসাসহ তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যায়।[৪] জেনে রাখো, প্রকৃতই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[৫] যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে নিজেদের অভিভাবক[৬] বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহই তাদের তত্বাবধায়ক। তুমি তাদের জিম্মাদার নও।[৭]

১. বক্তব্য শুরু করার এই ভঙ্গি থেকেই বুঝা যায়, সেই সময় পবিত্র মক্কার প্রতিটি মাহফিল ও গ্রাম্য বিপণী, প্রতিটি গলি ও বাজার এবং প্রতিটি বাড়ী ও বিপনীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলন ও কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে যে জোর গুজব, কানাঘুষা ও আলোচনা চলছিলো তা–ই ছিল এর পটভূমি। লোকেরা বলতো : এ ব্যক্তি কোথা থেকে এসব অভিনব কথা নিয়ে আসছে তা কে জানে। এ রকম কথা আমরা

কখনো শুনিনি বা হতেও দেখিনি। তারা বলতো ঃ বাপ–দাদা থেকে যে দীন চলে আসছে, গোটা জাতি যে দীন অনুসরণ করছে, সমগ্র দেশে যে নিয়ম পদ্ধতি শত শত বছর ধরে প্রচলিত আছে এ লোকটি তার সব কিছুকেই ভুল বলে আখ্যায়িত করছে এবং বলছে, আমি যে দীন পেশ করছি সেটিই ঠিক। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তারা বলতো ঃ এ লোকটি যদি এই বলে তার বক্তব্য পেশ করতো যে, বাপ–দাদার ধর্ম এবং প্রচলিত নিয়ম–পদ্ধতির মধ্যে তার দৃষ্টিতে কিছু দোষ–ত্রুটি আছে এবং সে চিন্তা–ভাবনা করে নিজে কিছু নতুন বিষয় বের করেছে তাহলে তা নিয়েও আলোচনা করা যেতো। কিন্তু সে বলে, আমি তোমাদের যা শুনাচ্ছি তা আল্লাহর বাণী। একথা কি করে মেনে নেয়া যায়। আল্লাহ কি তার কাছে আসেন? না কি সে নিজে আল্লাহর কাছে যায়। না তার ও আল্লাহর মধ্যে কথাবার্তা হয়? এসব আলোচনা ও কানাঘুষার জবাবে বাহ্যত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে কিন্তু মূলত কাফেরদের শুনিয়ে বলা হয়েছে ঃ হাঁ, মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময় আল্লাহ অহীর মাধ্যমে এসব কথাই বলছেন এবং পূর্বের সমস্ত নবী–রসূলদের কাছে এসব বিষয় নিয়েই অহী নাযিল হতো।

অহীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, দ্রুত ইংগিত এবং গোপন ইংগিত অর্থাৎ এমন ইংগিত যা অতি দ্রুত এমনভাবে করা হবে যে তা কেবল ইংগিতদাতা এবং যাকে ইংগিত করা হয়েছে সেই জানতে ও বুঝতে পারবে। তাছাড়া অন্য কেউ তা জানতে পারবে না। এ শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে এমন দিক নির্দেশনা বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কোন বান্দার মনে বিদ্যুৎ চমকের মত নিক্ষেপ করা হয়। আল্লাহর এ বাণীর উদ্দেশ্য হলো, কোন বান্দার কাছে আল্লাহর আসার কিংবা তাঁর কাছে কোন মানুষের যাওয়ার এবং সামনাসামনি কথা বলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়। মানুষের হিদায়াত ও দিকনির্দেশনার জন্য যখনই তিনি কোন বান্দার সাথে যোগাযোগ করতে চান তখন কোন অসুবিধাই তাঁর ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। এ কাজের জন্য তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা অহী পাঠানোর পথ অবলম্বন করেন। সূরার শেষ আয়াতগুলোতে এ বিষয়টিরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং সেখানে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

তাদের ধারণা ছিল এসব হচ্ছে অদ্ভুত ও অভিনব কথা। তার জবাবে বলা হয়েছে, এসব অদ্ভুত ও অভিনব কথা নয়। বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে যত নবী–রসূল এসেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকেই এসব হিদায়াতই দান করা হতো।

২. শুধু আল্লাহর প্রশংসার জন্য এই প্রারম্ভিক বাক্যটি বলা হচ্ছে না। যে পটভূমিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এর প্রতিটি শব্দ তার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে শোরগোল ও কানাঘুষা করছিলো তাদের আপত্তির প্রথম ভিত্তি হলো, নবী (সা) তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন এতে তারা উৎকর্ণ হয়ে বলতো ঃ যদি শুধুমাত্র আল্লাহ একাই উপাস্য, প্রয়োজন পূরণকারী এবং আইনদাতা হন তাহলে আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীগণ কোন্ মর্যাদার অধিকারী? এর জবাবে বলা হয়েছে এই গোটা বিশ্ব জাহান আল্লাহর সাম্রাজ্য। মালিকের মালিকানায় অন্য কারো খোদায়ী কি করে চলতে পারে? বিশেষ করে যাদের খোদায়ী মানা হয় কিংবা যারা

নিজেদের খোদায়ী চালাতে চায়। তারা নিজেরাও তাঁর মালিকানাভুক্ত তারপর বলা হয়েছে তিনি সর্বোন্নত ও মহান। তাই কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, ইখতিয়ার এবং অধিকারের মধ্যে কোনটিতেই অংশীদার হতে পারে না।

৩. অর্থাৎ কোন সৃষ্টির বংশধারা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা এবং তাকে আল্লাহর পুত্র বা কন্যা আখ্যায়িত করা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। কাউকে অভাব পূরণকারী ও বিপদ ত্রাণকারী বানিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তার কাছে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করেছে। কাউকে সারা দুনিয়ার সাহায্যকারী মনে করে নেয়া হয়েছে এবং প্রকাশ্যে বলতে শুরু করা হয়েছে যে, আমাদের হযরত সব সময় সব স্থানে সবার কথা শোনেন। তিনিই প্রত্যেকের সাহায্যের জন্য হাজির হয়ে তার কাজ উদ্ধার করে দেন। কাউকে আদেশ নিষেধ এবং হালাল ও হারামের মালিক মোখতার মেনে নেয়া হয়েছে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষ এমনভাবে তার নির্দেশের আনুগত্য করতে শুরু করেছে যেন সে-ই তাদের আল্লাহ। এগুলো আল্লাহর বিরুদ্ধে এমন ধৃষ্ঠতা যে এতে আসমান ভেঙে পড়াও অসম্ভব নয়। (সূরা মারয়ামের ৮৮ থেকে ৯১ আয়াতে এই একই বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে)।

৪. অর্থাৎ মানুষের এসব কথা শুনে শুনে ফেরেশতারা এই বলে কানে হাত দেয় যে, আমাদের রব সম্পর্কে এসব কি বাজে বলা হচ্ছে এবং পৃথিবীর এই মাখলুক এ কি ধরনের বিদ্রোহ করেছে? তারা বলে ঃ সুবহানাল্লাহ! কে এমন মর্যাদার অধিকারী হতে পারে যে, বিশ্ব জাহানের রবের সাথে 'উলুহিয়াত' ও সার্বভৌম ক্ষমতায় শরীক হতে পারে। তিনি ছাড়া আমাদের ওসব বান্দার জন্য আর কে পৃষ্ঠপোষক আছে যে তার প্রশংসা গীতি গাইতে হবে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। তাছাড়া তারা উপলব্ধি করে যে, পৃথিবীতে এটা এমন এক মহা অপরাধ করা হচ্ছে যার কারণে যে কোন সময় আল্লাহর গযব নেমে আসতে পারে। তাই তারা পৃথিবীতে বসবাসকারী এই আত্মসংহারী বান্দাদের জন্য বার বার এই বলে দয়া ও করুণার আবেদন জানায় যে, তাদেরকে যেন এখনই শাস্তি দেয়া না হয় এবং সামলে নেয়ার জন্য তাদেরকে আরো কিছুটা সুযোগ দেয়া হয়।

৫. অর্থাৎ এটা তাঁর উদারতা, দয়া ও ক্ষমাশীলতা যার কল্যাণে কুফর, শিরক ও নাস্তিকতা এবং পাপাচার ও চরম জুলুম-নির্যাতনে লিপ্ত ব্যক্তিরাও বছরের পর বছর, এমনকি এ ধরনের পুরো এক একটা সমাজ শত শত বছর পর্যন্ত এক নাগাড়ে অবকাশ পেয়ে থাকে। তারা শুধু রিযিকই লাভ করে না, পৃথিবীতে তাদের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ে তাছাড়া পৃথিবীর এমন সব উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম দ্বারা তারা অনুগৃহীত হয় যা দেখে নির্বোধ লোকেরা এই ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হয় যে, হয়তো এ পৃথিবীর কোন খোদা-ই নেই।

৬. মূল আয়াতে اولياء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে আরবী ভাষায় যার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। বাতিল উপাস্যদের সম্পর্কে পথভ্রষ্ট মানুষদের বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস এবং ভিন্ন ভিন্ন অনেক কর্মপদ্ধতি আছে। কুরআন মজীদে এগুলোকেই "আল্লাহ ছাড়া অন্যদের অভিভাবক বানানো" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুরআন মজীদে অনুসন্ধান করলে ولى শব্দটির নিম্নবর্ণিত অর্থসমূহ জানা যায় ঃ

এক ঃ মানুষ যার কথামত কাজ করে, যার নির্দেশনা মেনে চলে এবং যার রচিত নিয়ম–পন্থা, রীতিনীতি এবং আইন–কানুন অনুসরণ করে (আন নিসা, আয়াত ১১৮ থেকে ১২০; আল–আ'রাফ, আয়াত ৩ ও ২৭ থেকে ৩০)।

দুই ঃ যার দিকনির্দেশনার (Guidance) ওপর মানুষ আস্থা স্থাপন করে এবং মনে করে সে তাকে সঠিক রাস্তা প্রদর্শনকারী এবং ভ্রান্তি থেকে রক্ষাকারী। (আল বাকারা–২৫৭; বানী ইসরাঈল–৯৭; আল কাহাফ–১৭ ও আল জাসিয়া–১৯ আয়াত)।

তিন ঃ যার সম্পর্কে মানুষ মনে করে, আমি পৃথিবীতে যাই করি না কেন সে আমাকে তার কুফল থেকে রক্ষা করবে। এমনকি যদি আল্লাহ থাকেন এবং আখেরাত সংঘটিত হয় তাহলে তার আযাব থেকেও রক্ষা করবেন (আন নিসা– ১২৩–১৭৩; আল আনআম–৫১; আর রা'দ ৩৭; আল আনকাবুত–২২; আল আহযাব–৬৫; আয–যুমার–৩ আয়াত)।

চার ঃ যার সম্পর্কে মানুষ মনে করে, পৃথিবীতে তিনি অতি প্রাকৃতিক উপায়ে তাকে সাহায্য করেন, বিপদাপদে তাকে রক্ষা করেন। রুজি–রোজগার দান করেন, সন্তান দান করেন, ইচ্ছা পূরণ করেন এবং অন্যান্য সব রকম প্রয়োজন পূরণ করেন (হুদ–২০, আর রা'দ–১৬ ও আল আনকাবুত–৪১ আয়াত)।

অলী (ولى) শব্দটি কুরআন মজীদের কোন কোন জায়গায় ওপরে বর্ণিত অর্থসমূহের কোন একটি বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং কোথাও কোথাও সবগুলো অর্থ একত্রেও বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটি তারই একটি। এখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অলী বা অভিভাবক বানানোর অর্থ ওপরে বর্ণিত চারটি অর্থেই তাদেরকে পৃষ্টপোষক, সহযোগী ও সাহায্যকারী মনে করা।

৭. আল্লাহই তাদের তত্বাবধায়ক অর্থাৎ তিনি তাদের সমস্ত কাজকর্ম দেখছেন এবং তাদের আমলনামা প্রস্তুত করছেন। তাদের কাছে জবাবদিহি চাওয়া ও তাদেরকে পাকড়াও করা তাঁরই কাজ। "তুমি তাদের জিম্মাদার নও"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের ভাগ্য তোমার হাতে তুলে দেয়া হয়নি যে, যারা তোমার কথা মানবে না তাদেরকে তুমি জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে, কিংবা ক্ষমতাচ্যুত করবে অথবা তছনছ করে ফেলবে। একথার অর্থ আবার এও নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে সে রকম মনে করতেন। তাই তাঁর ভুল ধারণা বা আত্মবিভ্রম দূর করার জন্য একথা বলা হয়েছে। বরং কাফেরদের শুনানোই এর মূল উদ্দেশ্য। যদিও বাহ্যিকভাবে নবীকেই (সা) সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাফেরদেরকে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, তোমাদের মধ্যে যারা খোদাপ্রাপ্তি এবং আধ্যাত্মিকতার প্রহসন করে সাধারণত যেভাবে ঘটা করে তা দাবী করে আল্লাহর নবী তেমন কোন দাবী করেন না। জাহেলী সমাজে সাধারণভাবে এ ধারণা প্রচলিত আছে যে, 'দরবেশ' শ্রেণীর লোকেরা এমন প্রতিটি মানুষের ভাগ্য নষ্ট করে দেয় যারা তাদের সাথে বে–আদবী করে। এমনকি তাদের মৃত্যুর পরেও কেউ যদি তাদের কবরেরও অবমাননা করে এবং অন্য কিছু না করলেও যদি তাদের মনের মধ্যে কোন খারাপ ধারণার উদয় হয় তাহলেই তাকে ধ্বংস করে দেয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ ধারণা ঐ সব "দরবেশ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ۝٧ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝٨ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ الْمَوْتٰى ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝٩

হে নবী, এভাবেই আমি এই আরবী কুরআন অহী করে তোমার কাছে পাঠিয়েছি[৮] যাতে তুমি জনপদসমূহের কেন্দ্র (মক্কানগরী) ও তার আশেপাশের অধিবাসীদের সতর্ক করে দাও[৯] এবং একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে ভয় দেখাও[১০] যার আগমনে কোন সন্দেহ নেই। এক দলকে জান্নাতে যেতে হবে এবং অপর দলকে যেতে হবে দোযখে।

আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে এদের সবাইকে এক উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতের মধ্যে শামিল করেন। জালেমদের না আছে কোন অভিভাবক না আছে সাহায্যকারী।[১১] এরা কি (এমনই নির্বোধ যে) তাকে বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে? অভিভাবক তো একমাত্র আল্লাহ। তিনিই মৃতদের জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছুর ওপর শক্তিশালী।[১২]

মহামান্যরা" নিজেরাই প্রচার করেন এবং যেসব নেককার লোক নিজেরা এ কাজ করেন না কিছু ধূর্ত লোক তাদের হাড্ডিসমূহকে নিজেদের ব্যবসায়ের পুঁজি বানানোর জন্য তাদের সম্পর্কে এ ধারণা প্রচার করতে থাকে। যাই হোক মানুষের ভাগ্য গড়া ও ভাঙার ক্ষমতা–ইখতিয়ার থাকাকেই সাধারণ মানুষ রূহানিয়াত ও খোদাপ্রাপ্তির অতি আবশ্যকীয় দিক বলে মনে করেছে। প্রতারণার যাদুর এই মুখোশ খুলে দেয়ার জন্য আল্লাহ কাফেরদের শুনিয়ে তাঁর রসূলকে বলছেন, নিসন্দেহে তুমি আমার নবী এবং আমি তোমাকে আমার অহী দিয়ে সম্মানিত করেছি। শুধু মানুষকে সঠিক পথ দেখানোই তোমার কাজ। তাদের ভাগ্য তোমার হাতে তুলে দেয়া হয়নি। তা আমি নিজের হাতেই রেখেছি। বান্দার কাজকর্ম বিচার করা এবং তাদেরকে শাস্তি দেয়া বা না দেয়া আমার নিজের দায়িত্ব।

৮. বক্তব্যের প্রারম্ভে যা বলা হয়েছিলো সে কথার পুনরাবৃত্তি করে আরো জোর দিয়ে বলা হয়েছে। 'আরবী ভাষার কুরআন' বলে শ্রোতাদের বুঝানো হয়েছে, এটা অন্য কোন ভাষায় নয় তোমাদের নিজেদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। তোমরা নিজেরাই তা সরাসরি বুঝতে পারো। এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখো, আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া এই পাক-পবিত্র ও নিস্বার্থ দিক নির্দেশনা কি আর কারো পক্ষ থেকে হতে পারে?

৯. অর্থাৎ তাদেরকে গাফলতি থেকে জাগিয়ে দাও এবং এই মর্মে সতর্ক করে দাও যে, ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসের যে গোমরাহী এবং নৈতিকতা ও চরিত্রের যে অকল্যাণ ও ধ্বংসকারিতার মধ্যে তোমরা ডুবে আছ এবং তোমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় জীবন যে বিকৃত নীতিমালার ওপর চলছে তার পরিণাম ধ্বংস ছাড়া কিছু নয়।

১০. অর্থাৎ তাদেরকে এও বলে দাও যে, এই ধ্বংস শুধু দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, ভবিষ্যতে এমন দিনও আসবে যখন আল্লাহ সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে তাদের হিসাব নিবেন। কোন ব্যক্তি যদি তার গোমরাহী ও দুষ্কর্মের পরিণাম ফল থেকে পৃথিবীতে বেঁচে গিয়েও থাকে তাহলে সেদিন তার বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। আর সেই ব্যক্তি তো বড়ই দুর্ভাগা যে এখানেও অকল্যাণ লাভ করলো, সেখানেও দুর্ভাগ্যের শিকার হলো।

১১. এখানে এই বক্তব্যের মধ্যে একথাটি বলার তিনটি উদ্দেশ্য আছে ঃ

প্রথমত-এ কথা বলার উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা এবং সান্ত্বনা দান করা। এতে নবীকে (সা) বুঝানো হয়েছে, তিনি মক্কার কাফেরদের অজ্ঞতা, গোমরাহী ও বাহ্যিক ভাবে তাদের একগুঁয়েমী ও হঠকারিতা দেখে যেন বেশী মনোকষ্ট ও দুঃখ না পান। মানুষকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও নির্বাচন করার স্বাধীনতা দেয়াই আল্লাহর ইচ্ছা। তারপর যে হিদায়াত চাইবে সে হিদায়াত লাভ করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হতে চাইবে সে পথভ্রষ্ট হবে। সে যেদিকে যেতে চায় সেদিকেই যাবে। আল্লাহর অভিপ্রায় ও বিবেচ্য যদি এটা না হতো তাহলে নবী-রসূল ও কিতাব পাঠানোর প্রয়োজনই বা কি ছিল? সে জন্য মহান আল্লাহর একটি সৃষ্টিসূচক ইংগিতই যথেষ্ট ছিল। এভাবে সমস্ত মানুষ ঠিক তেমনি তাঁর আদেশ মেনে চলতো যেমন আদেশ মেনে চলে নদী, পাহাড়, গাছ, মাটি, পাথর ও সমস্ত জীবজন্তু। (এ উদ্দেশ্যে এ বিষয়টি কুরআন মজীদের অন্যান্য জায়গায়ও বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ৩৫, ৩৬ ও ১০৭ টীকাসহ।

দ্বিতীয়ত-আল্লাহ যদি সত্যিই মানুষকে পথ দেখাতে চাইতেন আর মানুষের মধ্যে আকীদা ও কর্মের যে পার্থক্য বিস্তার লাভ করে আছে তা তাঁর পসন্দ না হতো এবং মানুষ ঈমান ও ইসলামের পথ অনুসরণ করুক তাই যদি তাঁর মনঃপুত, তাহলে এই কিতাব ও নবুওয়াতের কি প্রয়োজন ছিল? এ ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে যেসব মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছিলো এখানে তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি সব মানুষকে মু'মিন ও মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করে এ কাজ সহজেই করতে পারতেন। এই বিভ্রান্তি ও দ্বিধা দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি হিসেবে যুক্তি দেখানো হয় যে, আল্লাহ যখন তা করেননি তখন নিশ্চয়ই তিনি ভিন্ন কোন পথ পসন্দ করেন। আমরা যে পথে চলছি সেটিই সেই পথ আর যা কিছু করছি তাঁরই ইচ্ছায় করছি। তাই এ ব্যাপারে আপত্তি করার অধিকার কারো নেই। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর

করার জন্যও এ বিষয়টি কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ১১২, ১৩৮, ১৪৮, ১৪৯ টীকাসহ; সূরা নূর এর (তাফহীম) ভূমিকা; ইউনুস আয়াত ৯৯, টীকাসহ; হূদ আয়াত ১১৮ টীকাসহ; আন নাহল, আয়াত ৯ টীকাসহ, আয়াত ৩৬ ও ৩৭ টীকাসহ।

তৃতীয়ত–এর উদ্দেশ্য দীনের প্রচার ও আল্লাহর সৃষ্টির সংশোধন ও সংস্কারের পথে যেসব বিপদাপদ আসে ঈমানদারদেরকে তার বাস্তবতা ও তাৎপর্য উপলব্ধি করানো। যারা আল্লাহর দেয়া বাছাই ও ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং তার ভিত্তিতে স্বভাব–চরিত্র ও পন্থা–পদ্ধতির ভিন্ন হওয়ার বাস্তবতা উপলব্ধি করে না তারা কখনো সংস্কার কার্যের মন্থর গতি দেখে নিরাশ হতে থাকে। তারা চায় আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু 'কারামত' ও 'মু'জিযা' দেখানো যা দেখামাত্র মানুষের মন পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আবার কখনো তারা প্রয়োজনের অধিক আবেগ–উত্তেজনার বশে সংস্কারের অবৈধ পন্থা–পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে (এ উদ্দেশ্যেও কুরআন মজীদের কয়েকটি জায়গায় এ বিষয়টি বলা হয়েছে। দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা রা'দ আয়াত ৩১ টীকাসহ; সূরা নাহল, আয়াত ৯০ থেকে ৯৩ টীকাসহ।)

এ উদ্দেশ্যে একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ কয়টি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব এবং আখেরাতে তাঁর জান্নাত কোন সাধারণ রহমত নয় যা মাটি ও পাথর এবং গাধা ও ঘোড়ার মত মর্যাদার সৃষ্টিকুলকে সাধারণ ভাবে বন্টন করে দেয়া যায়। এটা তো একটা বিশেষ এবং অনেক উচ্চ পর্যায়ের রহমত যার জন্য ফেরেশতাদেরকেও উপযুক্ত মনে করা হয়নি। এ কারণেই মানুষকে একটি স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সম্পন্ন সৃষ্টির মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করে আল্লাহ তাঁর পৃথিবীর এসব অঢেল উপায়–উপকরণ তার কর্তৃত্বাধীনে দিয়েছেন এবং এসব সাংঘাতিক শক্তিও তাকে দান করেছেন। যাতে সে সেই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে এবং এতে কামিয়াব হওয়ার পরই কেবল কোন বান্দা তাঁর এই বিশেষ রহমত লাভের উপযুক্ত হতে পারে। এ রহমত আল্লাহর নিজের জিনিস। এর ওপর আর কারো ইজারাদারী নেই। কেউ তার ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তিতে তা দাবী করেও নিতে পারে না। এমন শক্তিও কারো নেই যে, জোর করেই তা লাভ করতে পারে। সে–ই কেবল তা নিতে পারে যে আল্লাহর কাছে তার দাসত্ব পেশ করবে, তাঁকেই নিজের অভিভাবক বানাবে এবং তাঁরই সাথে লেগে থাকবে। এ অবস্থায় আল্লাহ তাকে সাহায্য ও দিকনির্দেশনা দান করেন এবং তাকে নিরাপদে এ পরীক্ষা পাস করার তাওফীক দান করেন যাতে সে তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু যে জালেম আল্লাহর দিক থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে নিজের অভিভাবক বানিয়ে নেয়, অযথা জোর করে তাঁর অভিভাবক হওয়ার এমন কোন প্রয়োজন আল্লাহর পড়েনি। সে অন্য যাদেরকে অভিভাবক বানায় তাদের আদৌ এমন কোন জ্ঞান, শক্তি বা ক্ষমতা–ইখতিয়ার নেই যার ভিত্তিতে অভিভাবকত্বের হক আদায় করে তাকে সফল করিয়ে দিতে পারে।

১২. অর্থাৎ অভিভাবকত্ব কোন মনগড়া বস্তু নয় যে, আপনি যাকে ইচ্ছা আপনার অভিভাবক বানিয়ে নিবেন আর বাস্তবেও সে আপনার অভিভাবক হয়ে যাবে এবং

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

তোমাদের[১৩] মধ্যে যে ব্যাপারেই মতানৈক্য হোকনা কেন তার ফয়সালা করা আল্লাহর কাজ।[১৪] সেই আল্লাহই আমার[১৫] রব, আমি তাঁর ওপরেই ভরসা করেছি এবং তাঁর কাছেই আমি ফিরে যাই।[১৬] আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, যিনি তোমাদের আপন প্রজাতি থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপ অন্যান্য জীবজন্তুর ও (তাদের নিজ প্রজাতি থেকে) জোড়া বানিয়েছেন এবং এই নিয়মে তিনি তোমাদের প্রজন্মের বিস্তার ঘটান। বিশ্ব জাহানের কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।[১৭] তিনি সব কিছু শোনেন ও দেখেন।[১৮] আসমান ও যমীনের ভাণ্ডারসমূহের চাবি তাঁরই হাতে, যাকে ইচ্ছা অঢেল রিযিক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা মেপে দেন। তিনি সব কিছু জানেন।[১৯]

অভিভাবকত্বের হক আদায় করবে। এটা এমন এক বাস্তব জিনিস যা মানুষের আশা আকাংখা অনুসারে হয় না বা পরিবর্তিতও হয় না। আপনি মানেন আর না মানেন বাস্তবে যিনি অভিভাবক তিনিই আপনার অভিভাবক। আর বাস্তবে যে অভিভাবক নয় আপনি মৃত্যু পর্যন্ত তাকে মানলেও এবং অভিভাবক মনে করলেও সে অভিভাবক নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু আল্লাহই অভিভাবক আর কেউ অভিভাবক নয় তার প্রমাণ কি? এর জবাব হচ্ছে, মানুষের প্রকৃত অভিভাবক হতে পারেন তিনি যিনি মৃত্যুকে জীবনে রূপ দেন, যিনি প্রাণহীন বস্তুর মধ্যে জীবন দান করে জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করার শক্তি ও ইখতিয়ারের অধিকারী। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ যদি তেমন থাকে তাহলে তাকে অভিভাবক বানাও। আর যদি শুধু আল্লাহই তেমন হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা এবং আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৩. এই গোটা অনুচ্ছেদটি যদিও আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে বলা হয়েছে, কিন্তু বক্তা এখানে আল্লাহ নন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মহান আল্লাহ যেন তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তুমি একথা ঘোষণা করো। কুরান মজীদে এ ধরনের বিষয়বস্তুত কোথাও قُلْ (হে নবী, তুমি বলো) শব্দ দ্বারা শুরু হয় এবং কোথাও তা ছাড়াই শুরু হয়। সে ক্ষেত্রে কথার ভঙ্গিই বলে দেয়, এখানে বক্তা আল্লাহ নন, আল্লাহর রসূল। কোন কোন স্থানে তো আল্লাহর বাণীর বক্তা থাকেন ঈমানদারগণ। এর উদাহরণ সূরা ফাতেহা, কিংবা ফেরেশতাগণ। যেমন সূরা মার্‌য়ামের ৬৪ থেকে ৬৫ আয়াত।

১৪. এটা আল্লাহর বিশ্ব জাহানের অধিপতি এবং সত্যিকার অভিভাবক হওয়ার স্বাভাবিক ও যৌক্তিক দাবী। রাজত্ব ও অভিভাবকত্ব যখন তাঁরই তখন শাসকও অনিবার্যরূপে তিনিই এবং মানুষের পারস্পরিক ঝগড়া–বিবাদ ও মতানৈক্যের ফায়সালা করাও তাঁরই কাজ। যারা এ বিষয়টিকে আখেরাতের জন্য নির্দিষ্ট বলে মনে করে তারা ভুল করে। আল্লাহর এই সার্বভৌম মর্যাদা যে এই দুনিয়ার জন্য নয়, শুধু মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য তার কোন প্রমাণ নেই। একইভাবে যারা তাঁকে শুধু এই দুনিয়ার আকীদা–বিশ্বাস এবং কতিপয় ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করে তারাও ভুল করে। কুরআন মজীদের ভাষা ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক। তাতে সব রকম বিবাদ ও মতানৈক্যের ক্ষেত্রে তা একমাত্র আল্লাহকেই ফায়সালা করার প্রকৃত অধিকারী বলে পরিষ্কার ও সুনিশ্চিতভাবে আখ্যায়িত করছে। সেই অনুসারে আল্লাহ যেমন আখেরাতের مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (প্রতিদান দিবসের মালিক) তেমনি এই পৃথিবীরও أَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ (সব শাসকের চাইতে বড় শাসক)। আকীদাগত মতানৈক্যের ক্ষেত্রে হক কোনটি আর বাতিল কোনটি সে বিষয়ের ফায়সালা যেমন তিনিই করবেন তেমনি আইনগত ক্ষেত্রেও তিনিই ফায়সালা করবেন মানুষের জন্য কোন্‌টি পবিত্র আর কোন্‌টি অপবিত্র, কোনটি বৈধ ও হালাল আর কোন্‌টি হারাম ও মাকরূহ? নৈতিকতার ক্ষেত্রে অন্যায় ও অশোভন কি আর ন্যায় ও শোভনীয় কি? পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন্‌টি কার প্রাপ্য আর কোনটি প্রাপ্য নয়? জীবনাচার, সভ্যতা, রাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোন্ পন্থা ও পদ্ধতি বৈধ আর কোনটি ভুল ও অবৈধ তাঁর সবই তিনি স্থির করবেন। এর ওপর ভিত্তি করেই তো আইনের মূলনীতি হিসেবে কুরআন মজীদে একথা বিধিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে যে,

فَإِنْ تَنَا زَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ – النساء : ٥٩

(যদি কোন ব্যাপারে তোমরা বিবাদে জড়িয়ে পড়ো তাহলে সেটিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ফিরিয়ে দাও)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ – الاحزب : ٣٦

(আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন ব্যাপারে ফায়সালা করে দেন তখন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর জন্য সে ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকে না) এবং

اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَتَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ – الاعراف : ٣

(তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করো এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো না।)

তাছাড়া যে প্রসঙ্গে এ আয়াত এসেছে তার মধ্যেও এটি আরো একটি অর্থ প্রকাশ করছে। সেটি হচ্ছে আল্লাহ শুধু মতবিরোধসমূহের মীমাংসা করার আইনগত অধিকারীই নন, যা মানা বা না মানার ওপর ব্যক্তির কাফের বা মু'মিন হওয়া নির্ভরশীল। বরং প্রকৃতপক্ষে কার্যত তিনিই হক ও বাতিলের ফায়সালা করছেন, যে কারণে বাতিল ও তার পূজারীরা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয় এবং হক ও তার অনুসারীরা সফলকাম হয়। পৃথিবীর মানুষ যে ফায়সালা কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হচ্ছে বলে যতই মনে করুক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। পরবর্তী ২৪ আয়াতেও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে এবং এর আগেও কুরআন মজীদের কতিপয় স্থানে আলোচিত হয়েছে। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আর রা'দ, টীকা ৩৪–৬০; সূরা ইবরাহীম, টীকা ২৬–৩৪; সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ১০০; সূরা আম্বিয়া ১৫, ১৮–৪৪, ৪৬)

১৫. অর্থাৎ যিনি মতবিরোধসমূহের ফায়সালাকারী আসল শাসক।

১৬. এ দু'টি ক্রিয়াপদ। এর একটি অতীতকাল সূচক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এবং অপরটি বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল সূচক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যার মধ্যে চলমানতা বা নিরবচ্ছিন্নতার অর্থ বিদ্যমান। অতীতকাল সূচক শব্দে বলা হয়েছে ঃ আমি তাঁর ওপরেই ভরসা করেছি। "অর্থাৎ একবার আমি চিরদিনের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে তাঁরই সাহায্য, তাঁরই দিক নির্দেশনা, তাঁরই আশ্রয় ও সংরক্ষণ এবং তাঁরই সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতে হবে। অতপর বর্তমান ও ভবিষ্যত সূচক ক্রিয়াপদটিতে বলা হয়েছে ঃ আমি তাঁর কাছেই ফিরে যাই।" অর্থাৎ আমার জীবনে যা–ই ঘটে সে ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছেই ফিরে যাই। কোন বিপদাপদ, দুঃখ–কষ্ট বা অসুবিধার সম্মুখীন হলে আর কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। কোন বিপদ আপতিত হলে তাঁর আশ্রয় তালাশ করি এবং তাঁর নিরাপত্তার ওপর নির্ভর করি। কোন সমস্যা দেখা দিলে তাঁর কাছে দিক নির্দেশনা চাই এবং তাঁরই শিক্ষা ও নির্দেশনামায় সে সমস্যার সমাধান ও সিদ্ধান্ত অনুসন্ধান করি। আর কোন বিবাদের মুখোমুখি হলে তাঁরই দিকে চেয়ে থাকি। কেননা, তিনিই তার চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এ বিষয়ে তিনি যে ফায়সালা করবেন সেটিই হবে সঠিক ও ন্যায়সংগত।

১৭. মূল আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "কোন জিনিসই তাঁর মত জিনিসের অনুরূপও নয়।" তাফসীরকার ও ভাষাবিদদের কেউ কেউ বলেন ঃ এ বাক্যাংশে مثل শব্দটির কাফ বর্নটি (সামঞ্জস্যের অর্থ প্রকাশক হরফ) সংযোজন বাকধারা হিসেবে করা হয়েছে। বক্তব্যকে জোরালো করাই এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং আরবে এ ধরনের বর্ণনাভঙ্গি প্রচলিত। যেমন ঃ কবি বলেন ঃ وقتلى كمثل جذوع النخل অন্য আরেকজন কবি বলেছেন ঃ ما ان كمثلهم فى الناس من احد অপর কিছু সংখ্যক লোকের মত হলো ঃ "তাঁর মত কেউ নেই" বলার চেয়ে তাঁর মত জিনিসের অনুরূপও কেউ নেই বলার মধ্যে অতিশয়তার অর্থ আছে। অর্থাৎ আল্লাহর মত তো দূরের কথা

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾

তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেই সব নিয়ম–কানুন নির্ধারিত করেছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং (হে মুহাম্মাদ) যা এখন আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার আদেশ দিয়েছিলাম আমি ইবরাহীম (আ) মূসা (আ) ও ঈসাকে (আ)। তার সাথে তাগিদ করেছিলাম এই বলে যে, এ দীনকে কায়েম করো এবং এ ব্যাপারে পরস্পর ভিন্ন হয়ো না।[২০] *(হে মুহাম্মাদ) এই কথাটিই এসব মুশরিকের কাছে অত্যন্ত অপসন্দনীয় যার দিকে তুমি তাদের আহবান জানাচ্ছো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন করে নেন এবং তিনি তাদেরকেই নিজের কাছে আসার পথ দেখান যারা তাঁর প্রতি রুজু করে।*[২১]

অসম্ভব হলেও যদি আল্লাহর সদৃশ কোন বস্তু আছে বলে ধরে নেয়া যায়, তাহলে সেই সদৃশের অনুরূপ কোন জিনিসও থাকতো না।

১৮. অর্থাৎ একই সাথে গোটা বিশ্ব জাহানের সবারই কথা শুনছেন এবং সব কিছুই দেখছেন।

১৯. শুধু একমাত্র আল্লাহই কেন প্রকৃত অভিভাবক, তাঁর ওপর নির্ভর করাই যুক্তিযুক্ত ও সঠিক কেন এবং কেন শুধু তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে, এগুলোই তার যুক্তি। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নামল, টীকা ৭৩–৮৩; সূরা আর রূম টীকা ২৫–৩১)

২০. প্রথম আয়াতে যে কথাটি বলা হয়েছিলো এখানে সেই কথাটিই আরো বেশী পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নন। নবী–রসূলদের মধ্যে কেউই কোন নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। প্রথম থেকেই সমস্ত নবী–রসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে একই দীন পেশ করে আসছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেই একই দীন পেশ করছেন। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম হযরত নূহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মহাপ্লাবনের পর তিনিই ছিলেন বর্তমান মানব গোষ্ঠীর সর্বপ্রথম পয়গম্বর। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি শেষ নবী। তারপর হযরত ইবরাহীমের (আ) নাম উল্লেখ করা হয়েছে, আরবের লোকেরা যাঁকে তাদের নেতা

বলে মানতো। সর্বশেষে হযরত মূসা এবং ঈসার কথা বলা হয়েছে যাঁদের সাথে ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের ধর্মকে সম্পর্কিত করে থাকে। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, শুধু এই পাঁচজন নবীকেই উক্ত দীনের হিদায়াত দান করা হয়েছিলো। বরং একথা বলে দেয়াই এর উদ্দেশ্য যে, পৃথিবীতে যত নবী-রসূলই আগমন করেছেন তাঁরা সবাই একই দীন নিয়ে এসেছেন। নমুনা হিসেবে এমন পাঁচজন মহান নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাঁদের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষ সুবিখ্যাত আসমানী শরীয়তসমূহ লাভ করেছে।

যেহেতু এ আয়াতটি দীন ও দীনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করেছে। তাই সে বিষয়ে ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাকে বুঝে নেয়া আবশ্যক ঃ

বলা হয়েছে شَرَعَ لَكُمْ "তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন।" شَرَعَ শব্দের আভিধানিক অর্থ রাস্তা তৈরী করা এবং এর পারিভাষিক অর্থ পদ্ধতি, বিধি ও নিয়ম-কানুন রচনা করা। এই পারিভাষিক অর্থ অনুসারে আরবী ভাষায় تشريع শব্দটি আইন প্রণয়ন(Legislation) شرع এবং شريعت শব্দটি আইন (Law) এবং شارع শব্দটি আইন প্রণেতার (Lawgiver) সমার্থক বলে মনে করা হয়। আল্লাহই বিশ্ব জাহানের সব কিছুর মালিক, তিনিই মানুষের প্রকৃত অভিভাবক এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়েই মতভেদ হোক না কেন তার ফায়সালা করা তাঁরই কাজ। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের যেসব মৌলিক সত্য বর্ণিত হয়েছে তারই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক পরিণতি হচ্ছে আল্লাহর এই আইন রচনা। এখন মৌলিকভাবে যেহেতু আল্লাহই মালিক, অভিভাবক ও শাসক, তাই মানুষের জন্য আইন ও বিধি রচনার এবং মানুষকে এই আইন ও বিধি দেয়ার অনিবার্য অধিকার তাঁরই। আর এভাবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

পরে বলা হয়েছে مِنَ الدِّيْنِ 'দীন' থেকে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী এর অনুবাদ করেছেন আইন থেকে। অর্থাৎ আল্লাহ শরীয়ত নির্ধারণ করেছেন আইনের পর্যায়ভুক্ত। আমরা ইতিপূর্বে সূরা যুমারে ৩নং টীকায় دِيْن শব্দের যে ব্যাখ্যা করেছি তা যদি সামনে থাকে তাহলে একথা বুঝতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, দীন অর্থই কারো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তার আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করা। এ শব্দটি যখন পন্থা বা পদ্ধতি অর্থে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হয় এমন পদ্ধতি যাকে ব্যক্তি অবশ্য অনুসরণীয় পদ্ধতি এবং তার যার নির্ধারণকারীকে অবশ্য অনুসরণযোগ্য বলে মেনে চলে। এ কারণে আল্লাহর নির্ধারিত এই পদ্ধতিকে দীনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আইন বলার পরিষ্কার অর্থ হলো এটা শুধু সুপারিশ (Recomendation) ও ওয়াজ-নসীহতের মর্যাদা সম্পন্ন নয়। বরং তা বান্দার জন্য তার মালিকের অবশ্য অনুসরণীয় আইন, যার অনুসরণ না করার অর্থ বিদ্রোহ করা। যে ব্যক্তি তা অনুসরণ করে না সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আধিপত্য, সার্বভৌমত্ব এবং দাসত্ব অস্বীকার করে।

এর পরে বলা হয়েছে, দীনের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত এ আইনই সেই আইন যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো নূহ, ইবরাহীম ও মূসা আলাইহিমুস সালামকে এবং এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সে নির্দেশই দান করা হয়েছে। এ বাণী থেকে কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়। এক—আল্লাহ এ বিধানকে সরাসরি সব মানুষের কাছে পাঠাননি, বরং মাঝে মধ্যে যখনই তিনি প্রয়োজন মনে করেছেন এক ব্যক্তিকে তাঁর রসূল মনোনীত করে

এ বিধান তার কাছে সোপর্দ করেছেন। দুই—প্রথম থেকেই এ বিধান এক ও অভিন্ন। এমন নয় যে, কোন জাতির জন্য কোন একটি দীন নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং অন্য সময় অপর এক জাতির জন্য তা থেকে ভিন্ন ও বিপরীত কোন দীন পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে একাধিক দীন আসেনি। বরং যখনই এসেছে এই একটি মাত্র দীনই এসেছে। তিন—আল্লাহর আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব মানার সাথে সাথে যাদের মাধ্যমে এ বিধান পাঠানো হয়েছে তাদের রিসালাত মানা এবং যে অহীর দ্বারা এ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তা মেনে নেয়া এ দীনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির দাবীও তাই। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত তা আল্লাহর তরফ থেকে বিশ্বাসযোগ্য (Authentic) হওয়া সম্পর্কে ব্যক্তি নিশ্চিত না হবে ততক্ষণ সে এই আনুগত্য করতেই পারে না।

অতপর বলা হয়েছে, এসব নবী-রসূলদেরকে দীনের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত এই বিধান দেয়ার সাথে তাগিদসহ এ নির্দেশও দেয়া হয়েছিলো যে, أَقِيمُوا الدِّينَ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী এ আয়াতাংশের অনুবাদ করেছেন "দীনকে কায়েম করো" আর শাহ রফিউদ্দিন ও শাহ আবদুল কাদের অনুবাদ করেছেন, "দীনকে কায়েম রাখো" এই দু'টি অনুবাদই সঠিক। اقامت শব্দের অর্থ কায়েম করা ও কায়েম রাখা উভয়ই। নবী-রসূলগণ আলাইহিমুস সালাম এ দু'টি কাজ করতেই আদিষ্ট ছিলেন। তাঁদের প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, যেখানে এই দীন কায়েম নেই সেখানে তা কায়েম করা। আর দ্বিতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল যেখানে তা কায়েম হবে কিংবা পূর্ব থেকেই কায়েম আছে সেখানে তা কায়েম রাখা। একথা সুস্পষ্ট যে কোন জিনিসকে কায়েম রাখার প্রশ্ন তখনই আসে যখন তা কায়েম থাকে। অন্যথায় প্রথমে তা কায়েম করতে হবে, তারপর তা যাতে কায়েম থাকে সে জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

এই পর্যায়ে আমাদের সামনে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। একটি হলো, দীন কায়েম করার অর্থ কি? অপরটি হলো, দীন অর্থই বা কি যা কায়েম করার এবং কায়েম রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে? এ দু'টি বিষয়ও ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার।

কায়েম করা কথাটি যখন কোন বস্তুগত বা দেহধারী জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয় উপবিষ্টকে উঠানো। যেমন কোন মানুষ বা জন্তুকে উঠানো। কিংবা পড়ে থাকা জিনিসকে উঠিয়ে দাঁড় করানো। যেমন বাঁশ বা কোন থাম তুলে দাঁড় করানো অথবা কোন জিনিসের বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে একত্র করে সমুন্নত করা। যেমন ঃ কোন খালি জায়গায় বিল্ডিং নির্মাণ করা। কিন্তু যা বস্তুগত জিনিস নয়, অবস্তুগত জিনিস তার জন্য যখন কায়েম করা শব্দটা ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ শুধু সেই জিনিসের প্রচার করাই নয়, বরং তা যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করা, তার প্রচলন ঘটানো এবং কার্যত চালু করা। উদাহরণ স্বরূপ যখন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি তার রাজত্ব কায়েম করেছে তখন তার অর্থ এ হয় না যে, সে তার রাজত্বের দিকে আহবান জানিয়েছে। বরং তার অর্থ হয়, সে দেশের লোকদেরকে নিজের অনুগত করে নিয়েছে এবং সরকারের সকল বিভাগে এমন সংগঠন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেছে যে, দেশের সমস্ত ব্যবস্থাপনা তার নির্দেশ অনুসারে চলতে শুরু করেছে। অনুরূপ যখন আমরা বলি, দেশে আদালত কায়েম আছে তখন তার অর্থ হয় ইনসাফ করার জন্য বিচারক নিয়োজিত আছেন। তিনি মোকদ্দমা সমূহের শুনানি করছেন এবং ফায়সালা দিচ্ছেন। একথার এ অর্থ কখনো হয় না যে, ন্যায়

বিচার ও ইনসাফের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা খুব ভালভাবে করা হচ্ছে এবং মানুষ তা সমর্থন করছে। অনুরূপভাবে কুরআন মজীদে যখন নির্দেশ দেয়া হয়, নামায কায়েম করো তখন তার অর্থ কুরআন মজীদের দাওয়াত ও তাবলীগ নয়, বরং তার অর্থ হয় নামাযের সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করে শুধু নিজে আদায় করা না বরং এমন ব্যবস্থা করা যেন ঈমানদারদের মধ্যে তা নিয়মিত প্রচলিত হয়। মসজিদের ব্যবস্থা থাকে, গুরুত্বের সাথে জুমআ ও জামা'য়াত ব্যবস্থা হয়, সময়মত আযান দেয়া হয়, ইমাম ও খতিব নির্দিষ্ট থাকে এবং মানুষের মধ্যে সময়মত মসজিদে আসা ও নামায আদায় করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। এই ব্যাখ্যার পরে একথা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, নবী–রসূল আলাইহিমুস সালামদের যখন এই দীন কায়েম করার ও রাখার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তার অর্থ শুধু এতটুকুই ছিল না যে, তাঁরা নিজেরাই কেবল এ দীনের বিধান মেনে চলবেন এবং অন্যদের কাছে তার তাবলীগ বা প্রচার করবেন, যাতে মানুষ তার সত্যতা মেনে নেয়। বরং তার অর্থ এটাও যে মানুষ যখন তা মেনে নেবে তখন আরো অগ্রসর হয়ে তাদের মাঝে পুরো দীনের প্রচলন ঘটাবেন, যাতে সে অনুসারে কাজ আরম্ভ হতে এবং চলতে থাকে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে দাওয়াত ও তাবলীগ এ কাজের অতি আবশ্যিক প্রাথমিক স্তর। এই স্তর ছাড়া দ্বিতীয় স্তর আসতেই পারে না। কিন্তু প্রত্যেক বিবেক–বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন এই নির্দেশের মধ্যে দীনের দাওয়াত ও তাবলীগকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানানো হয়নি, দীনকে কায়েম করা ও কায়েম রাখাকেই উদ্দেশ্য বানানো হয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগ অবশ্যই এ উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়। নবী–রসূলদের মিশনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দাওয়াত ও তাবলীগ করো একথা বলা একেবারেই অবান্তর।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটি দেখুন। কেউ কেউ দেখলেন, যে দীন কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা সমানভাবে সমস্ত নবী–রসূলের দীন। কিন্তু তাদের সবার শরীয়ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যেমন আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেছেন لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا "আমি তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্য স্বতন্ত্র শরীয়ত এবং একটি পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছি।" তাই তারা ধরে নিয়েছে যে, এ দীন অর্থ নিশ্চয়ই শরীয়তের আদেশ–নিষেধ ও বিধি–বিধান নয়, এর অর্থ শুধু তাওহীদ, আখেরাত, কিতাব ও নবুওয়াতকে মানা এবং আল্লাহর ইবাদাত করা। কিংবা বড় জোর তার মধ্যে শরীয়তের সেই সব বড় বড় নৈতিক নীতিমালাও অন্তর্ভুক্ত যা সমস্ত দীনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

কিন্তু এটি একটি অপরিপক্ক মত। শুধু বাহ্যিকভাবে দীনের ঐক্য ও শরীয়তসমূহের বিভিন্নতা দেখে এ মত পোষণ করা হয়েছে। এটি এমন একটি বিপজ্জনক মত যে যদি তা সংশোধন করা না হয় তাহলে তা অগ্রসর হয়ে দীন ও শরীয়তের মধ্যে এমন একটি পার্থক্যের সূচনা করবে যার মধ্যে জড়িয়ে সেন্ট পল শরীয়ত বিহীন দীনের মতবাদ পেশ করেছিলেন এবং সাইয়েদেনা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মতকে ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করেছিলেন। কারণ, শরীয়ত যখন দীন থেকে স্বতন্ত্র একটি জিনিস আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধু দীন কায়েমের জন্য, শরীয়ত কায়েমের জন্য নয় তখন মুসলমানরাও খৃষ্টানদের মত অবশ্যই শরীয়তকে গুরুত্বহীন ও তার প্রতিষ্ঠাকে সরাসরি উদ্দেশ্য মনে না করে উপেক্ষা করবে এবং দীনের শুধু ঈমান সম্পর্কিত বিষয়গুলো ও বড় বড় নৈতিক

নীতিসমূহ নিয়েই বসে থাকবে। এভাবে অনুমানের ওপর নির্ভর করে دين এর অর্থ নিরূপণ করার পরিবর্তে কেনই বা আমরা আল্লাহর কিতাব থেকেই একথা জেনে নিচ্ছি না যে, যে দীন কায়েম করার নির্দেশ এখানে দান করা হয়েছে তার অর্থ কি শুধু ঈমান সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং কতিপয় বড় বড় নৈতিক মূলনীতি না শরীয়তের অন্যান্য আদেশ নিষেধও? কুরআন মজীদ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি কুরআন মজীদে যেসব জিনিসকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোও আছে ঃ

এক ঃ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ – البينة : ٥

"তাদেরকে এ ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা একনিষ্ঠ চিত্তে দীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে কেবল তাঁরই ইবাদাত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে এটাই সঠিক দীন।"

এ আয়াত থেকে জানা যায়, নামায এবং রোযা এই দীনের অন্তর্ভুক্ত। অথচ নামায ও রোযার আহকাম বিভিন্ন শরীয়তে বিভিন্ন রকম ছিল। পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে বর্তমানের মত নামাযের এই একই নিয়ম–কানুন, একই খুঁটি–নাটি বিষয়, একই সমান রাকআত, একই কিবলা, একই সময় এবং এই একই বিধি–বিধান ছিল একথা কেউ বলতে পারে না। অনুরূপ যাকাত সম্পর্কেও কেউ এ দাবী করতে পারে না যে, সমস্ত শরীয়তে বর্তমানের ন্যায় যাকাতের এই একই নিসাব, একই হার এবং আদায় ও বন্টনের এই একই বিধিনিষেধ ছিল। কিন্তু শরীয়তের ভিন্নতা সত্ত্বেও আল্লাহ এ দুটি জিনিসকে দীনের মধ্যে গণ্য করেছেন।

দুই ঃ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ .... اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ .... – المائده : ٣

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহকৃত জন্তু, দমবন্ধ হয়ে, আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, ওপর থেকে পড়ে কিংবা ধাক্কা খেয়ে মরা জন্তু অথবা যে জন্তুকে কোন হিংস্র প্রাণী ক্ষতবিক্ষত করেছে কিন্তু তাকে তোমরা জীবিত পেয়ে যবেহ করেছো অথবা যে জন্তুকে কোন আস্তানায় যবেহ করা হয়েছে। তাছাড়া লটারীর মাধ্যমে নিজের ভাগ্য সম্পর্কে অবহিত হতে চাওয়াকেও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এসবই গুনাহর কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দীন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গিয়েছে। তাই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম।"

এ থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের এসব হুকুম আহকামও দীনের মধ্যে শামিল।

তিন ঃ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ – (التوبة : ٢٩)

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে বিশ্বাস করে না, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা কিছু হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দীনকে নিজের দীন হিসেবে গ্রহণ করে না।"

এ থেকে জানা যায়, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব আদেশ–নিষেধ দিয়েছেন তা মানা ও তার আনুগত্য করাও দীন।

চার ঃ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ – النور : ٢

"ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ উভয়কে একশটি করে বেত্রাঘাত করো। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করো তাহলে দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি মায়া–মমতা ও আবেগ যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে।"

مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ – يوسف : ٧٦

"বাদশার দীন অনুসারে ইউসুফ তার ভাইকে পাকড়াও করতে পারতো না।"

এ থেকে জানা গেলো, ফৌজদারী আইনসমূহও দীনের মধ্যে শামিল। ব্যক্তি যদি আল্লাহর দেয়া ফৌজদারী আইন অনুসারে চলে তাহলে সে আল্লাহর দীনের অনুসারী আর যদি বাদশার দীন অনুসারে চলে তাহলে বাদশাহর দীনের অনুসারী।

এ চারটি উদাহরণই এমন যেখানে শরীয়তের আদেশ–নিষেধ ও বিধি–বিধানকে সুস্পষ্ট ভাষায় দীন বলা হয়েছে। কিন্তু গভীর মনোযোগ সহকারে দেখলে বুঝা যায়, আরো যেসব গোনাহর কারণে আল্লাহ জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন (যেমন ব্যভিচার, সুদখোরী, মু'মিন বান্দাকে হত্যা, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ, অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ নেয়া ইত্যাদি) যেসব অপরাধকে আল্লাহর শাস্তির কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন ঃ লূতের কওমের মত পাপাচার এবং পারস্পরিক লেনদেনে শু'আইব আলাইহিস সালামের কওমের মত আচরণ) তার পথ রুদ্ধ করার কাজও অবশ্যই দীন হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। কারণ, দীন যদি জাহান্নাম ও আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য না এসে থাকে তাহলে আর কিসের জন্য এসেছে। অনুরূপ শরীয়তের যেসব আদেশ–নিষেধ লংঘনকে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসের কারণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেই সব আদেশ–নিষেধ ও দীনের অংশ হওয়া উচিত। যেমন উত্তরাধিকারের বিধি–বিধান বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ – النساء : ١٤

"যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে এবং আল্লাহর সীমাসমূহ লংঘন করবে আল্লাহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।"

অনুরূপ আল্লাহ যেসব জিনিসের হারাম হওয়ার কথা কঠোর ভাষায় অকাট্যভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন ঃ মা, বোন ও মেয়ের সাথে বিয়ে, মদ্যপান, চুরি, জুয়া এবং মিথ্যা

সাক্ষ্যদান। এসব জিনিসের হারাম হওয়ার নির্দেশকে যদি "ইকামাতে দীন" বা দীন প্রতিষ্ঠার মধ্যে গণ্য করা না হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ কিছু অপ্রয়োজনীয় আদেশ–নিষেধও দিয়েছেন যার বাস্তবায়ন তাঁর উদ্দেশ্য নয়। অনুরূপ আল্লাহ যেসব কাজ ফরয করেছেন, যেমন ঃ রোযা ও হজ্জ—তাও দীন প্রতিষ্ঠার পর্যায় থেকে এই অজুহাতে বাদ দেয়া যায় না যে, রমযানের ৩০ রোযা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে ছিল না এবং কা'বায় হজ্জ করা কেবল সেই শরীয়তেই ছিল যা ইবরাহীমের (আ) বংশধারার ইসমাঈলী শাখাকে দেয়া হয়েছিলো।

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির কারণ হলো, ভিন্ন উদ্দেশ্যে لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا (আমি তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি শরীয়ত ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি) আয়াতের এ অর্থ করা যে, যেহেতু প্রত্যেক উম্মতের জন্য শরীয়ত ছিল ভিন্ন কিন্তু কায়েম করতে বলা হয়েছে দীনকে যা সমানভাবে সব নবী–রসূলের দীন ছিল, তাই দীন কায়েমের নির্দেশের মধ্যে শরীয়ত অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ এ আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সূরা মায়েদার যে স্থানে এ আয়াতটি আছে তার পূর্বাপর অর্থাৎ ৪১ আয়াত থেকে ৫০ আয়াত পর্যন্ত যদি কেউ মনযোগ সহকারে পাঠ করে তাহলে সে জানতে পারবে আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ যে নবীর উম্মতকে যে শরীয়ত দিয়েছিলেন সেটিই ছিল তাদের জন্য দীন এবং সেই নবীর নবুওয়াত কালে সেটিই কায়েম করা কাম্য ও উদ্দেশ্য ছিল। এখন যেহেতু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের যুগ, তাই উম্মতে মুহাম্মাদীকে যে শরীয়ত দান করা হয়েছে এ যুগের জন্য সেটিই দীন এবং সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করাই দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা। এরপর থাকে ঐ সব শরীয়তের পরস্পর ভিন্নতা। এ ভিন্নতার তাৎপর্য এ নয় যে, আল্লাহর প্রেরিত শরীয়তসমূহ পরস্পর বিরোধী ছিল। বরং এর সঠিক তাৎপর্য হলো, অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ঐ সব শরীয়তের খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু পার্থক্য ছিল। উদাহরণ স্বরূপ নামায ও রোযার কথাই ধরুন। সকল শরীয়তেই নামায কায়েম ফরয ছিল কিন্তু সব শরীয়তের কিবলা এক ছিল না। তাছাড়া নামাযের সময়, রাকআতের সংখ্যা এবং বিভিন্ন অংশে কিছুটা পার্থক্য ছিল। অনুরূপ রোযা সব শরীয়তেই ফরয ছিল। কিন্তু রমযানের ৩০ রোযা অন্যান্য শরীয়তে ছিল না। এ থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঠিক নয় যে, নামায ও রোযা 'ইকামাতে দীন' বা দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত ঠিকই, কিন্তু নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নামায পড়া এবং নির্দিষ্ট কোন সময়ে রোযা রাখা ইকামতে দীনের নির্দেশ বহির্ভূত। বরং এর সঠিক অর্থ হলো, প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্য তৎকালীন শরীয়তে নামায ও রোযা আদায়ের জন্য যে নিয়ম–পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছিলো সেই সময়ে সেই পদ্ধতি অনুসারে নামায পড়া ও রোযা রাখাই ছিল দীন কায়েম করা। বর্তমানেও এসব ইবাদতের জন্য শরীয়তে মুহাম্মাদীতে যে নিয়ম–পদ্ধতি দেয়া হয়েছে সে মোতাবেক এসব ইবাদত বন্দেগী করা 'ইকামাতে দীন'। এ দু'টি দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে শরীয়তের অন্যসব আদেশ–নিষেধও বিচার করুন।

যে ব্যক্তি চোখ খুলে কুরআন মজীদ পড়বে সে স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, এ গ্রন্থ তার অনুসারীদেরকে কুফরী ও কাফেরদের আজ্ঞাধীন ধরে নিয়ে বিজিতের অবস্থানে থেকে ধর্মীয় জীবন যাপন করার কর্মসূচী দিচ্ছে না, বরং প্রকাশ্যে নিজের শাসন ও কর্তৃত্ব

প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে, চিন্তাগত, নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আইনগত ও রাজনৈতিক ভাবে বিজয়ী করার লক্ষ্যে জীবনপাত করার জন্য অনুসারীদের কাছে দাবী করছে এবং তাদেরকে মানব জীবনের সংস্কার ও সংশোধনের এমন একটি কর্মসূচী দিচ্ছে যার একটা বৃহদাংশ কেবল তখনই বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে যদি সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ঈমানদারদের হাতে থাকে। এ কিতাব তার নাযিল করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলে ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

النساء : ١٠٥ -

"হে নবী, আমি ন্যায় ও সত্যসহ তোমার কাছে এই কিতাব নাযিল করেছি যাতে আল্লাহ তোমাকে যে আলো দেখিয়েছেন তার সাহায্যে তুমি মানুষের মধ্যে ফায়সালা করো।"

এই কিতাবে যাকাত আদায় ও বন্টনের যে নির্দেশাবলী দেয়া হয়েছে সে জন্য তা সুস্পষ্টভাবে এমন একটি সরকারের ধারণা পেশ করেছে যে, একটি নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে যাকাত আদায় করে হকদারদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব নেবে (আত তাওবা ৬০ ও ১০৩ আয়াত)। এই কিতাবে সুদ বন্ধ করার যে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং সুদখোরী চালু রাখার কাজে তৎপর লোকদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। (আল বাকারা ২৭৫–২৭৯ আয়াত) তা কেবল তখনই বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে যখন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে ঈমানদারদের হাতে থাকবে। এই কিতাবে হত্যাকারীর থেকে কিসাস গ্রহণের নির্দেশ (আল বাকারা ১৭৮ আয়াত), চুরির জন্য হাত কাটার নির্দেশ (আল মায়েদা ৩৮ আয়াত) এবং ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের জন্য হদ জারী করার নির্দেশ একথা ধরে নিয়ে দেয়া হয়নি যে, এসব আদেশ মান্যকারীদেরকে কাফেরদের পুলিশ ও বিচারালয়ের অধীন থাকতে হবে। এই কিতাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নির্দেশ (আল বাকারা–১৯০–২১৬ আয়াত) একথা মনে করে দেয়া হয়নি যে, এ দীনের অনুসারীরা কাফের সরকারের বাহিনীতে সৈন্য ভর্তি করে এ নির্দেশ পালন করবে। এ কিতাবে আহলে কিতাবদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ (আত তাওবা ২৯ আয়াত) একথা ধরে নিয়ে দেয়া হয়নি যে, মুসলমানরা কাফেরদের অধীন থেকে তাদের থেকে জিযিয়া আদায় করে এবং তাদের রক্ষার দায়িত্ব নেবে। এ ব্যাপারটি শুধু মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। দৃষ্টিশক্তির অধিকারীরা মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে স্পষ্টতই দেখতে পারেন, প্রথম থেকেই যে পরিকল্পনা ছিল তা ছিলো দীনের বিজয় ও কর্তৃত্ব স্থাপন, কুফরী সরকারের অধীনে দীন ও দীনের অনুসারীদের জিম্মি হয়ে থাকা নয়। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা বানী–ইসরাঈল, আয়াত ৭৬ ও ৮০; সূরা কাসাস, আয়াত ৮৫–৮৬; সূরা রূম, আয়াত ১ থেকে ৬; সূরা আস সাফফাত, আয়াত ১৭১ থেকে ১৭৯, (টীকা ৯৩–৯৪) এবং সূরা সোয়াদ, ভূমিকা ও ১১ আয়াত ১২ টীকা সহ।

ব্যাখ্যার এই ভ্রান্তি যে জিনিসটির সাথে সবচেয়ে বেশী সাংঘর্ষিক তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বিরাট কাজ। যা তিনি ২৩ বছরের রিসালাত যুগে সমাধা করেছেন। তিনি তাবলীগ ও তলোয়ার উভয়টির সাহায্যেই যে গোটা আরবকে

বশীভূত করেছিলেন এবং বিস্তারিত শরীয়ত বা বিধি–বিধানসহ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় আদর্শ কায়েম করেছিলেন যা আকীদা–বিশ্বাস ও ইবাদাত থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড, সামাজিক চরিত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি, রাজনীতি ও ন্যায় বিচার এবং যুদ্ধ ও সন্ধিসহ জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত ছিল তা কেনা জানে? এ আয়াত অনুসারে নবী (সা)সহ সমস্ত নবী–রসূলকে ইকামাতে দীনের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো নবীর (সা) এসব কাজকে যদি তার ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করা না হয় তাহলে তার কেবল দু'টি অর্থই হতে পারে। হয় নবীর (সা) বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ করতে হবে (মা'আযাল্লাহ) যে, তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন শুধু ঈমান ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত বড় বড় মূলনীতিসমূহের তাবলীগ ও দাওয়াতের জন্য কিন্তু তা লংঘন করে তিনি নিজের পক্ষ থেকেই একটি সরকার কায়েম করেছিলেন, যা অন্যসব নবী–রসূলদের শরীয়ত–সমূহের সাধারণ নীতিমালা থেকে ভিন্নও ছিল অতিরিক্তও ছিল। নয়তো আল্লাহর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ করতে হবে যে, তিনি সূরা শূরায় উপরোক্ত ঘোষণা দেয়ার পর নিজেই তাঁর কথা থেকে সরে পড়েছেন এবং নিজের নবীর নিকট থেকে ঐ সূরায় ঘোষিত "ইকামাতে দীনের" চেয়ে কিছুটা বেশী এবং ভিন্ন ধরনের কাজই শুধু নেননি, বরং উক্ত কাজকে পূর্ণতা লাভের পর, নিজের প্রথম ঘোষণার পরিপন্থী দ্বিতীয় এই ঘোষণাটিও দিয়েছেন যে, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (আজ আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম) নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা। এ দুটি অবস্থা ছাড়া তৃতীয় এমন কোন অবস্থা যদি থাকে যে ক্ষেত্রে ইকামাতে দীনের এই ব্যাখ্যাও বহাল থাকে এবং আল্লাহ কিংবা তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও না আসে তাহলে আমরা অবশ্যই তা জানতে চাইবো।

দীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ এ আয়াতে সর্বশেষ যে কথা বলেছেন তা হচ্ছে وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ "দীনে বিভেদ সৃষ্টি করো না" কিংবা "তাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না।" দীনে বিভেদের অর্থ ব্যক্তির নিজের পক্ষ থেকে এমন কোন অভিনব বিষয় সৃষ্টি করা এবং তা মানা বা না মানার ওপর কুফর ও ঈমান নির্ভর করে বলে পীড়াপীড়ি করা এবং মান্যকারীদের নিয়ে অমান্যকারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া, অথচ দীনের মধ্যে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এই অভিনব বিষয়টি কয়েক ধরনের হতে পারে। দীনের মধ্যে যে জিনিস নেই তা এনে শামিল করা হতে পারে। দীনের অকাট্য উক্তিসমূহের বিকৃত প্রায় ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে অদ্ভুত আকীদা–বিশ্বাস এবং অভিনব আচার–অনুষ্ঠান আবিষ্কার করা হতে পারে। আবার দীনের উক্তি ও বক্তব্যসমূহ রদবদল করে তা বিকৃত করা, যেমন যা গুরুত্বপূর্ণ তাকে গুরুত্বহীন বানিয়ে দেয়া এবং যা একেবারেই মোবাহ পর্যায়ভুক্ত তাকে ফরয ও ওয়াজিব এমনকি আরো অগ্রসর হয়ে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বানিয়ে দেয়া। এ ধরনের আচরণের কারণেই নবী–রসূল আলাইহিমুস সালামদের উম্মতদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অতপর এসব ছোট ছোট দলের অনুসৃত পথই ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করেছে যার অনুসারীদের মধ্যে বর্তমানে এই ধারণাটুকু পর্যন্তও বর্তমান নেই যে, এক সময় তাদের মূল ছিল একই। দীনের আদেশ–নিষেধ বুঝার এবং অকাট্য উক্তিসমূহ নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করে মাসয়ালা উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর কিতাবের ভাষার মধ্যে আভিধানিক, বাগধারা ও ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে যার অবকাশ আছে সেই বৈধ ও যুক্তিসংগত মতভেদের সাথে এই বিবেদের কোন সম্পর্ক নেই

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿۱۴﴾ فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۵﴾

মানুষের কাছে যখন জ্ঞান এসে গিয়েছিল তারপরই তাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে।[২২] আর তা হওয়ার কারণ তারা একে অপরের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিলো।[২৩] একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মূলতবী রাখা হবে একথা যদি তোমার রব পূর্বেই ঘোষণা না করতেন তাহলে তাদের বিবাদের চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হতো।[২৪] প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, পূর্ববর্তীদের পরে যাদের কিতাবের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তারা সে ব্যাপারে বড় অস্বস্তিকর সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে।[২৫]

যেহেতু এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাই হে মুহাম্মাদ এখন তুমি সেই দীনের দিকেই আহবান জানাও এবং যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো সেভাবে দৃঢ়তার সাথে তা আঁকড়ে ধরো এবং এসব লোকের ইচ্ছা আকাংখার অনুসরণ করো না।[২৬] এদের বলে দাও, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার ওপর ঈমান এনেছি।[২৭] আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করি।[২৮] আল্লাহই আমাদেরও রব এবং তোমাদেরও রব তিনিই। আমাদের কাজকর্ম আমাদের জন্য আর তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্য।[২৯] আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন বিবাদ নেই।[৩০] একদিন আল্লাহ আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। তাঁর কাছেই সবাইকে যেতে হবে।"

এই বিষয় সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২১৩, টীকা ২৩০; সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৯, টীকা ১৬ ও ১৭, আয়াত ৫১, টীকা ৪৮; সূরা আন নিসা, আয়াত ১৭১, টীকা ২১১ থেকে ২১৬; আল মায়েদা, আয়াত ৭৭, টীকা ১০১, আল আনআম, আয়াত ১৫৯, টীকা ১৪১; সূরা আন নাহল, আয়াত ১১৮ থেকে ১২৪, টীকা ১১৭ থেকে ১২১; সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৯২–৯৩, টীকা ৯১, আল হাজ্জ, আয়াত ৬৭–৬৯, টীকা ১১৬, ১১৭; আল মু'মিনুন, আয়াত ৫১ থেকে ৫৬, টীকা ৪৫ থেকে ৪৯; সূরা আল কাসাস, আয়াত ৫৩ ও ৫৪, টীকা ৭৩; সূরা আর রুম, আয়াত ৩২ থেকে ৩৫, টীকা ৫১ থেকে ৫৪)।

২১. ইতিপূর্বে ৮ ও ৯ আয়াতে যা বলা হয়েছে এবং ১১ টীকায় আমরা তার যে ব্যাখ্যা করেছি এখানে আবার তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এখানে একথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা এসব লোকদেরকে দীনের সুস্পষ্ট রাজপথ দেখিয়ে দিচ্ছো আর এ নির্বোধরা এই নিয়ামতকে মূল্য দেয়ার পরিবর্তে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছে। কিন্তু এদেরই মধ্যে এদেরই কওমের এমন সব লোক আছে যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসছে এবং আল্লাহও বেছে বেছে তাদেরকে নিজের দিকে নিয়ে আসছেন। কারা এ নিয়ামত লাভ করে এবং কারা এর প্রতি খাপ্পা হয় তা নিজ নিজ ভাগ্যের ব্যাপার। তবে আল্লাহ অন্ধভাবে কোন কিছু বন্টন করেন না। যে তাঁর দিকে অগ্রসর হয় তিনি কেবল তাকেই নিজের দিকে টানেন। দূরে পলায়নপর লোকদের পেছনে দৌড়ানো আল্লাহর কাজ নয়।

২২. অর্থাৎ বিভেদের কারণ এ ছিল না যে, আল্লাহ নবী–রসূল পাঠাননি এবং কিতাবও নাযিল করেননি, তাই সঠিক পথ না জানার কারণে মানুষ নিজেদের জন্য আলাদা আলাদা ধর্ম, চিন্তা গোষ্ঠী ও জীবন আদর্শ আবিষ্কার করে নিয়েছে। বরং তাদের মধ্যে এই বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান আসার পর। তাই সে জন্য আল্লাহ দায়ী নন, বরং সেই সব লোক নিজেরাই দায়ী যারা দীনের সুস্পষ্ট নীতিমালা এবং শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধি–নিষেধ থেকে দূরে সরে গিয়ে নতুন নতুন ধর্ম ও পথ বানিয়ে নিয়েছে।

২৩. অর্থাৎ কোন প্রকার সদিচ্ছা এই মতভেদ সৃষ্টির চালিকা শক্তি ছিল না। এটা ছিল তোমাদের অভিনব ধারণা প্রকাশের আকাংখা। নিজের নাম ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চিন্তা, পারস্পরিক জিদ ও একগুঁয়েমি, একে অপরকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টা এবং সম্পদ ও মর্যাদা অর্জন প্রচেষ্টার ফল। ধূর্ত ও উচ্চাভিলাসী লোকগুলো দেখলো, আল্লাহর বান্দারা যদি সোজাসুজি আল্লাহর দীন অনুসরণ করতে থাকে তাহলে একজনই মাত্র খোদা হবেন মানুষ যার সামনে মাথা নত করবে, একজন রসূল হবেন মানুষ নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে যাকে মেনে চলবে, একখানা কিতাব থাকবে যেখান থেকে মানুষ পথনির্দেশনা লাভ করবে এবং একটি পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট আকীদা–বিশ্বাস ও নির্ভেজাল বিধান থাকবে মানুষ যা অনুসরণ করতে থাকবে। এই ব্যবস্থায় তাদের নিজেদের জন্য কোন বিশেষ মর্যাদা থাকতে পারে না যে কারণে তাদের পৌরহিত্য চলবে, লোকজন তাদের পাশে ভিড় জমাবে তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং পকেট ও শূন্য করবে। এটাই সেই মূল কারণ যা নতুন নতুন আকীদা ও দর্শন, নতুন নতুন ইবাদত–পদ্ধতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং নতুন নতুন জীবনাদর্শ উদ্ভাবনের উৎসাহ যুগিয়েছে এবং আল্লাহর বান্দাদের একটি বড় অংশকে দীনের সুস্পষ্ট রাজপথ থেকে সরিয়ে বিভিন্ন পথে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে।

তারপর এ বিক্ষিপ্ততা এসব দল–উপদলের পারস্পরিক বিতর্ক ও বিবাদ এবং ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কলহের কারণে চরম তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছে। এমনকি এ থেকে এমন রক্তপাতও ঘটেছে যে জন্য মানবেতিহাস রক্ত রঞ্জিত হয়ে চলেছে।

২৪. অর্থাৎ যারা গোমরাহী উদ্ভাবন করার এবং জেনে বুঝে তা অনুসরণ করার অপরাধে অপরাধী ছিল তাদেরকে দুনিয়াতেই আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হতো এবং শুধু সঠিক পথ অনুসরণকারীদের বাঁচিয়ে রাখা হতো যার মাধ্যমে কে ন্যায় ও সত্যের অনুসারী আর কে বাতিলের অনুসারী তা সুস্পষ্ট হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ এই চূড়ান্ত ফায়সালা কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য মুলতবী করে রেখেছেন। কারণ, পৃথিবীতে এ ফায়সালা করে দেয়ার পর মানব জাতির পরীক্ষা অর্থহীন হয়ে যেতো।

২৫. অর্থাৎ প্রত্যেক নবী এবং তাঁর নিকট অনুসারীদের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহর কিতাব পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌছলে তারা দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থার সাথে তা গ্রহণ করেনি, বরং তারা সে সম্পর্কে বড় সন্দেহ সংশয় এবং মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার হয়েছে। তাদের এ পরিস্থিতির শিকার হওয়ার অনেকগুলো কারণ ছিল। তাওরাত ও ইনজীলে ঐ সব পরিস্থিতি সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা অতি সহজেই সেই সব কারণ অনুধাবন করতে পারি। পূর্ববর্তী প্রজন্মের লোকেরা এ দুটি গ্রন্থকে তার মূল অবস্থায় মূল রচনাশৈলী ও ভাষায় সংরক্ষিত করে পরবর্তী প্রজন্মের লোকদের কাছে পৌছায়নি। তার মধ্যে আল্লাহর বাণীর সাথে ব্যাখ্যা, ইতিহাস এবং জনশ্রুতিমূলক ঐতিহ্য ও ফিকাহবিদদের উদ্ভাবিত খুঁটিনাটি বিষয়সমূহের আকারে মানুষের কথাও মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছে। এ দুটি গ্রন্থের অনুবাদের এত অধিক মাত্রায় প্রচলন করেছে যে, মূল গ্রন্থ হারিয়ে গিয়েছে এবং কেবল তার অনুবাদই টিকে আছে। এর ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহকেও এমনভাবে ধ্বংস করে ফেলেছে যে, এখন আর কেউই পুরো নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারে না তার কাছে যে কিতাব আছে পৃথিবীবাসী সেটিই হযরত মূসা বা হযরত ঈসার মাধ্যমে লাভ করেছিলো। তাছাড়া মাঝে মধ্যে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতরা ধর্ম, অধিবিদ্যা, দর্শন, আইন, পদার্থবিদ্যা, মনস্তত্ব এবং সমাজবিজ্ঞানের এমন সব আলোচনা করেছেন এবং চিন্তাদর্শ গড়ে তুলেছেন যার গোলকধাঁধায় পড়ে মানুষের জন্য এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়েছে যে, আঁকাবাঁকা এসব পথের মধ্যে ন্যায় ও সত্যের রাজপথ কোনটি। আল্লাহর কিতাব যেহেতু মূল ও নির্ভরযোগ্য অবস্থায় বর্তমান ছিল না তাই মানুষ নির্ভরযোগ্য এমন কোন প্রমাণের স্বরণাপন্ন হতেও পারতো না যা বাতিল থেকে হককে আলাদা করার ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতে পারতো।

২৬. অর্থাৎ তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই দীনের মধ্যে কোন রদবদল ও হ্রাস–বৃদ্ধি করবে না। "কিছু নাও এবং কিছু দাও" এই নীতির ভিত্তিতে এই পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে কোন আপোষ করো না। শুধু কোন না কোন ভাবে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে এসে যাক, এ লোভের বশবতী হয়ে এদের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি এবং জাহেলী আচার–আচরণের জন্য দীনের মধ্যে কোন অবকাশ সৃষ্টি করো না। আল্লাহ তাঁর দীনকে যেভাবে নাযিল করেছেন কেউ মানতে চাইলে সেই খাঁটি ও মূল দীনকে যেন সরাসরি মেনে নেয়। অন্যথায় যে জাহান্নামে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায় পড়ুক। মানুষের ইচ্ছানুসারে আল্লাহর দীনের

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾

আল্লাহর আহবানে সাড়া দান করার পরে যারা (সাড়া দানকারীদের সাথে) আল্লাহর দীনের ব্যাপারে বিবাদ করে[৩১] আল্লাহর কাছে তাদের যুক্তি ও আপত্তি বাতিল। তাদের ওপর আল্লাহর গযব, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। এই কিতাব ও মিযান যথাযথভাবে আল্লাহই নাযিল করেছেন।[৩২] তুমি তো জান না, চূড়ান্ত ফায়সালার সময় হয়তো অতি নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে।[৩৩] যারা তা আসবে বলে বিশ্বাস করে না তারাই তার জন্য তাড়াহুড়া করে। কিন্তু যারা তা বিশ্বাস করে তারা তাকে ভয় করে। তারা জানে, অবশ্যই তা আসবে। ভাল করে শুনে নাও, যারা সেই সময়ের আগমনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য বিতর্ক করে তারা গোমরাহীর মধ্যে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান।[৩৪] যাকে যা ইচ্ছা তাই দান করেন।[৩৫] তিনি মহা শক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী।[৩৬]

পরিবর্তন সাধন করা যায় না। মানুষ যদি নিজের কল্যাণ চায় তাহলে যেন নিজেকেই পরিবর্তন করে দীন অনুসারে গড়ে নেয়।

২৭. অন্য কথায় আমি সেই বিভেদ সৃষ্টিকারী লোকদের মত নই যারা আল্লাহর প্রেরিত কোন কোন কিতাব মানে আবার কোন কোনটি মানে না। আমি আল্লাহর প্রেরিত প্রতিটি কিতাবই মানি।

২৮. এই ব্যাপকার্থক আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হয় ঃ একটি অর্থ হচ্ছে, আমি এসব দলাদলি থেকে দূরে থেকে নিরপেক্ষ ন্যায় নিষ্ঠা অবলম্বনের জন্য আদিষ্ট। কোন দলের স্বার্থে এবং কোন দলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করা আমার কাজ নয়। সব মানুষের সাথে আমার সমান সম্পর্ক। আর সে সম্পর্ক হচ্ছে ন্যায় বিচার ও ইনসাফের সম্পর্ক। যার যে

বিষয়টি ন্যায় ও সত্য সে যত দূরেরই হোক না কেন আমি তার সহযোগী। আর যার যে বিষয়টি ন্যায় ও সত্যের পরিপন্থী সে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও আমি তার বিরোধী।

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাদের সামনে যে সত্য পেশ করার জন্য আদিষ্ট তাতে কারো জন্য কোন বৈষম্য নেই, বরং তা সবার জন্য সমান। তাতে নিজের ও পরের, বড়র ও ছোটর, গরীবের ও ধনীর, উচ্চের ও নীচের ভিন্ন ভিন্ন সত্য নেই। যা সত্য তা সবার জন্য সত্য। যা গোনাহ তা সবার জন্য গোনাহ। যা হারাম তা সবার জন্য হারাম এবং যা অপরাধ তা সবার জন্য অপরাধ। এই নির্ভেজাল বিধানে আমার নিজের জন্যও কোন ব্যতিক্রম নেই।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, আমি পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আদিষ্ট। মানুষের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করা এবং তোমাদের জীবনে ও তোমাদের সমাজে যে ভারসাম্যহীনতা ও বে-ইনসাফী রয়েছে তার ধ্বংস সাধনের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে।

এ তিনটি অর্থ ছাড়া এ বাক্যাংশের আরো একটি অর্থ আছে যা পবিত্র মক্কায় প্রকাশ পায়নি কিন্তু হিজরতের পরে তা প্রকাশ পায়। সেটি হচ্ছে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত বিচারক। তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করা আমার দায়িত্ব।

২৯. আমাদের প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী এবং জবাবদিহিকারী। তোমরা নেক কাজ করলে তার সুফল আমি ভোগ করবো না, তোমরাই তা ভোগ করবে। অনুরূপ আমি খারাপ কাজ করলে সে জন্য তোমাদের পাকড়াও করা হবে না, আমাকেই তার পরিণাম ভোগ করতে হবে। একথাটিই ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ১৩৯ আয়াত, সূরা ইউনুসের ৪১ আয়াত, সূরা হূদের ৩৫ আয়াত এবং সূরা কাসাসের ৫৫ আয়াতে বলা হয়েছে। দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা, টীকা ১৩৯, সূরা ইউনুস টীকা ৪৯; সূরা হূদ, টীকা-৩৯; সূরা আল কাসাস, আয়াত ৫৫, টীকা ৭৯।

৩০. অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত দলীল-প্রমাণ দিয়ে কথা বুঝানোর যে দায়িত্ব আমার ছিল তা আমি পালন করেছি। এখন অযথা ঝগড়া-বিবাদ করে লাভ কি? তোমরা ঝগড়া-বিবাদ করলেও আমি তা করতে প্রস্তুত নই।

৩১. সেই সময় প্রতিদিনই মক্কায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিলো এখানে সেই পরিস্থিতির দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। লোকেরা কারো সম্পর্কে যখনই জানতে পারতো যে সে মুসলমান হয়েছে তখনই মরিয়া হয়ে তার পেছনে লেগে যেতো। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাকে কোনঠাসা করে রাখতো। না বাড়ীতে তাকে আরামে থাকতে দেয়া হতো, না মহল্লায় না জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে। সে যেখানেই যেতো সেখানেই অশেষ ও বিরামহীন এক বিতর্ক শুরু হতো। এর উদ্দেশ্য হতো, জাহেলিয়াত বর্জন করে যে ব্যক্তি তার গণ্ডীর বাইরে বের হয়ে গেছে সে যে কোনভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য ছেড়ে আবার সেদিকে ফিরে আসুক।

৩২. এখানে মীযান অর্থ আল্লাহর শরীয়ত, যা দাঁড়িপাল্লার মত ওজন করে ভুল ও শুদ্ধ, হক ও বাতিল, জুলুম ও ন্যায়বিচার এবং সত্য ও অসত্যের পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। ওপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে যে,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ
حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾ اَمْ لَهُمْ
شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةُ
الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ
مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

যে আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র চায় আমি তার কৃষিক্ষেত্র বাড়িয়ে দেই। আর যে দুনিয়ার কৃষিক্ষেত্র চায় তাকে দুনিয়ার অংশ থেকেই দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার কোন অংশ নেই।[৩৭]

এসব লোক কি আল্লাহর এমন কোন শরীকে বিশ্বাস করে যে এদের জন্য দীনের মত এমন একটি পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছে আল্লাহ যার অনুমোদন দেননি?[৩৮] *যদি ফায়সালার বিষয়টি পূর্বেই মীমাংসিত হয়ে না থাকতো তাহলে তাদের বিবাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়া হতো।*[৩৯] *এ জালেমদের জন্য নিশ্চিত কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে। তোমরা দেখতে পাবে, সে সময় এসব জালেম তাদের কৃতকর্মের ভয়াবহ পরিণামের আশংকা করতে থাকবে। আর সে পরিণাম তাদের জন্য আসবেই। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তারা জান্নাতের বাগ–বাগিচার মধ্যে অবস্থান করবে। তারা যা–ই চাইবে তা–ই তাদের রবের কাছে পাবে। এটাই বড় মেহেরবানী।*

أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ (তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করার জন্য আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই পবিত্র কিতাব সহকারে সেই 'মিযান' এসে গেছে যার সাহায্যে এই ইনসাফ কায়েম করা যাবে।

৩৩. অর্থাৎ যার সংশোধন হওয়ার সে যেন অবিলম্বে সংশোধিত হয়ে যায়। চূড়ান্ত ফায়সালার সময় দূরে মনে করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া উচিত নয়। একটি নিশ্বাস সম্পর্কেও

কেউ নিশ্চয়তার সাথে একথা বলতে পারে না যে, তার পরে শ্বাস গ্রহণের সুযোগ তার অবশ্যই হবে। প্রতিবার শ্বাস গ্রহণই শেষবারের মত শ্বাস গ্রহণ হতে পারে।

৩৪. মূল আয়াতে لَطِيْفٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার সঠিক ও পূরা অর্থ "দয়ালু" শব্দ দ্বারা প্রকাশ পায় না। এ শব্দটির মধ্যে দুটি অর্থ আছে। একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ, মায়া ও বদান্যতা প্রবণ। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত সুক্ষ্মদর্শিতার সাথে তার এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন যেখানে কারো দৃষ্টি যায় না। সে প্রয়োজনগুলো তিনি এমনভাবে পূরণ করেন যে বান্দা নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না কে কখন তার কোন্ প্রয়োজন পূরণ করেছে। তাছাড়া এখানে বান্দা অর্থ শুধু ঈমানদারেরাই নয়, বরং সমস্ত বান্দা। আল্লাহর এই দয়া ও মেহেরবানী তাঁর সব বান্দার জন্য সমান।

৩৫. অর্থাৎ তাঁর এই নির্বিশেষ মেহেরবানীর দাবি এ নয় যে, সব বান্দাকেই সব কিছু সমানভাবে দেয়া হবে। যদিও সবাইকে তিনি তাঁর নিজের ভাণ্ডার থেকেই দিচ্ছেন। কিন্তু সেই দান একই প্রকৃতির নয়। একজনকে দিয়েছেন একটি জিনিস আরেকজনকে অন্য একটি জিনিস। একজনকে একটি জিনিস প্রচুর পরিমাণে দিয়ে থাকেন অপর একজনকে অন্য কোন জিনিস অঢেল দান করেছেন।

৩৬. অর্থাৎ তাঁর দান ও পুরস্কারের এই ব্যবস্থা নিজের শক্তিতেই চলছে। কারো ক্ষমতা নেই তা পরিবর্তন করতে পারে বা জোরপূর্বক তাঁর নিকট থেকে কিছু নিতে পারে কিংবা কাউকে দান করার ব্যাপারে তাকে বিরত রাখতে পারে।

৩৭. পূর্ববর্তী আয়াতে দু'টি সত্য তুলে ধরা হয়েছে, যা আমরা সবসময় সর্বত্র দেখতে পাই। একটি হচ্ছে, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী তাঁর সব বান্দার জন্য সমান। অপরটি হচ্ছে, তাঁর দান ও রিযিক পৌঁছানোর বন্দোবস্ত সবার জন্য সমান নয়, বরং তার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। এখানে এ আয়াতে বলা হচ্ছে, তাঁর দয়া ও মেহেরবানী এবং রিযিক পৌঁছানোর ব্যবস্থায় ছোটখাট পার্থক্য অসংখ্য। কিন্তু একটি অনেক বড় মৌলিক পার্থক্যও আছে। সেটি হচ্ছে, আখেরাতের আকাংখী ব্যক্তির জন্য এক ধরনের রিযিক এবং দুনিয়ার আকাংখী ব্যক্তির জন্য অন্য ধরনের রিযিক।

এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্য যা এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে বলা হয়েছে। এটিকে বিস্তারিতভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কারণ তা প্রত্যেক মানুষকে তার ভূমিকা নির্ধারণে সাহায্য করে। যারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্য চেষ্টা-সাধনা ও কাজ করে এ আয়াতে তাদেরকে এমন কৃষকের সাথে তুলনা করা হয়েছে যারা ভূমি প্রস্তুত করা থেকে ফসল প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত উপর্যুপরি ঘাম ঝরায় এবং প্রাণান্তকর চেষ্টা চালায়। সে মাঠে যে বীজ বপন করছে তার ফসল আহরণ করে যেন উপকৃত হতে পারে সে জন্য সে এত সব পরিশ্রম করে কিন্তু নিয়ত ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য এবং বেশীর ভাগই কর্মপদ্ধতির পার্থক্য ও আখেরাতের ফসল বপনকারী কৃষক এবং পার্থিব ফসল বপনকারী কৃষকের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করে তাই আল্লাহ উভয় পরিশ্রমের ফলাফলও ভিন্ন রেখেছেন। অথচ এই পৃথিবীই উভয়ের কর্মক্ষেত্র।

আখেরাতের ফসল বপনকারী দুনিয়া লাভ করবে না আল্লাহ তা বলেননি। কম বা বেশী যাই হোক না কেন দুনিয়া তো সে পাবেই। কারণ এখানে আল্লাহর মেহেরবানী সবার জন্য সমান এবং তার মধ্যে তারও অংশ আছে। তাই ভালমন্দ সবাই এখানে রিযিক পাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ তাকে দুনিয়া লাভের সুসংবাদ দান করেননি, বরং তাকে সুসংবাদ দিয়েছেন এই বলে যে তার আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র বৃদ্ধি করা হবে। কেননা সে সেটিই চায় এবং সেখানকার পরিণামের চিন্তায় সে বিভোর। এই কৃষিক্ষেত্র বর্ধিত করার অনেকগুলো উপায় ও পন্থা হতে পারে। যেমন ঃ সে যতটা সদুদ্দেশ্য নিয়ে আখেরাতের জন্য নেক আমল করতে থাকবে তাকে তত বেশী নেক আমল করার সুযোগ দেয়া হবে এবং তার হৃদয়–মন নেক কাজের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। যখন সে পবিত্র উদ্দেশ্যের জন্য পবিত্র উপায় অবলম্বন করার সংকল্প করবে তখন তার জন্য পবিত্র উপায়–উপকরণের মধ্যে বরকত দান করা হবে। তার জন্য কল্যাণের সব দরজা বন্ধ হয়ে কেবল অকল্যাণের দরজাসমূহই খোলা থাকবে, আল্লাহ এ অবস্থা কখনো আসতে দেবেন না। তাছাড়া সব চেয়ে বড় কথা হলো তার এই পৃথিবীর সামান্য নেকীও আখেরাতে কমপক্ষে দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর বেশীর তো কোন সীমাই থাকবে না। আল্লাহ যার জন্য চাইবেন হাজার বা লক্ষগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন।

এখন থাকে দুনিয়ার কৃষি বপনকারীর কথা। অর্থাৎ যে আখেরাত চায় না এবং দুনিয়ার জন্যই সব কিছু করে। আল্লাহ তাকে তার এই চেষ্টা–সাধনার দুটি ফলের কথা সুস্পষ্টভাবে শুনিয়ে দিয়েছেন। এক, সে যত চেষ্টাই করুক না কেন দুনিয়া যতটা অর্জন করতে চায় তা সে পুরাপুরি পাবে না, বরং তার একটা অংশ মাত্র অর্থাৎ আল্লাহ তার জন্য যতটা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন ততটাই পাবে। দুই, সে যা কিছু পাবে এই দুনিয়াতেই পাবে। আখেরাতের কল্যাণে তার কোন অংশ থাকবে না।

৩৮. একথা সুস্পষ্ট যে এ আয়াতে شُرَكَاءُ অর্থে সেই সব শরীক বুঝানো হয়নি মানুষ যাদের কাছে প্রার্থনা করে বা যাদেরকে নযর–নিয়াজ দেয় কিংবা যাদের সামনে পূজা অর্চনার অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা হয়। বরং নিশ্চিতভাবে সেই সব মানুষকে বুঝানো হয়েছে মানুষ যাদেরকে আদেশ দানের ক্ষেত্রে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে, যাদের শেখানো ধ্যান–ধারণা, আকীদা–বিশ্বাস, মতবাদ এবং দর্শনের প্রতি মানুষ বিশ্বাস পোষণ করে, যাদের দেয়া মূল্যবোধ মেনে চলে, যাদের পেশকৃত নৈতিক নীতিমালা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদণ্ডসমূহ গ্রহণ করে, যাদের রচিত আইন–কানুন। পন্থা ও বিধি–বিধানকে নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ইবাদতসমূহে, ব্যক্তি জীবনে, সমাজে, সভ্যতায়, কায়কারবার ও লেনদেনে, বিচারালয়সমূহে এবং নিজেদের রাজনীতি ও সরকার ব্যবস্থায় এমনভাবে গ্রহণ করে যেন এটাই সেই শরীয়ত যার অনুসরণ তাদের করা উচিত। এটা যেন বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর রচিত আইনের পরিপন্থী একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং তাঁর অনুমোদন (Sanction) ছাড়াই উদ্ভাবকরা উদ্ভাবন করেছে এবং মান্যকারীরা মেনে নিয়েছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা এবং অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা যেমন শিরক এটাও ঠিক তেমনি শিরক। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ১–৭২, টীকা ১৭০, আয়াত ২৫৬, টীকা ২৮৬; আল ইমরান, আয়াত ৬৪ ও ৬৫, টীকা ৫৭ ও ৫৮, আয়াত ৭৫ থেকে ৭৭, টীকা ৬৪, ৬৫;

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ
لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً
نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿۲۳﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ
فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ
بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۲۴﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ
وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۲۵﴾

এটাই সেই জিনিস যার সুসংবাদ আল্লাহ তাঁর সেই সব বান্দাদের দেন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে। হে নবী, এসব লোককে বলে দাও, এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না।[৪০] তবে আত্মীয়তার ভালবাসা অবশ্যই চাই।[৪১] যে কল্যাণ উপার্জন করবে আমি তার জন্য তার সেই কল্যাণের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেব। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও নেক কাজের মর্যাদাদাতা।[৪২]

এ লোকেরা কি বলে, এই ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে অপবাদ তৈরী করেছে?[৪৩] আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার দিলের ওপর মোহর মেরে দিতেন।[৪৪] তিনি বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং নিজের আদেশে সত্যকে সত্য প্রমাণ করে দেখান।[৪৫] তিনি মনের গোপন বিষয়ও জানেন।[৪৬] তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করেন। অথচ তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর জানা আছে।[৪৭]

আন নিসা, আয়াত ৬০, টীকা ৯০; আল মায়েদা, আয়াত ১ ও ২ টীকাসহ, আয়াত ৮৭ ও ৮৮ টীকাসহ, আন'আম, আয়াত ১১৯ থেকে ১২১; টীকাসহ, আয়াত ১৩৬, ১৩৭ টীকাসহ; আত তাওবা, আয়াত ৩১ টীকাসহ; ইউনুস, আয়াত ৫৯, ৬০ টীকাসহ; ইবরাহীম, আয়াত ২২ টীকাসহ; সূরা আন নাহল, আয়াত ১১৩ থেকে ১১৫ টীকাসহ; আল কাহাফ, আয়াত ৫২ টীকাসহ; মার্‌য়াম, আয়াত ৪২ টীকাসহ; আল–কাসাস, আয়াত ৬২, ৬৩ টীকাসহ; সাবা আয়াত ৪১ টীকা ৬৩, ইয়াসীন, আয়াত ৬০, টীকা ৫৩)।

৩৯. অর্থাৎ এটা আল্লাহর বিরুদ্ধে এমন এক ধৃষ্টতা যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারটি যদি কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য মুলতবী করা না হতো তাহলে আল্লাহর বান্দা হয়ে যারা আল্লাহর পৃথিবীতে নিজেদের রচিত 'দীন' চালু করেছে তাদের প্রত্যেকের ওপর আযাব

নাযিল করা হতো এবং তাদেরকেও ধ্বংস করে দেয়া হতো যারা আল্লাহর দীন পরিত্যাগ করে অন্যদের রচিত দীন গ্রহণ করেছে।

৪০. 'এ কাজ' অর্থ যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানো এবং জান্নাতের সুসংবাদের উপযুক্ত বানানোর জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

৪১. মূল আয়াতের বাক্যাংশ হলো إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। তবে قُرْبٰى র ভালবাসা অবশ্যই প্রত্যাশা করি। এই قُرْبٰى শব্দটির ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের মধ্যে বেশ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

এক দল এ শব্দটিকে আত্মীয়তা (আত্মীয়তার বন্ধন) অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং আয়াতের অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, "আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক বা বিনিময় চাই না। তবে তোমাদের ও আমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে বন্ধন আছে তোমরা (কুরাইশরা) অন্তত সেদিকে লক্ষ্য রাখবে এতটুকু আমি অবশ্যই চাই। তোমাদের উচিত ছিল আমার কথা মেনে নেয়া। কিন্তু যদি তোমরা তা না মানো তাহলে গোটা আরবের মধ্যে সবার আগে তোমরাই আমার সাথে দুশমনী করতে বদ্ধপরিকর হবে তা অন্তত করো না।" এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যা। ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে জারীর, তাবারানী, বায়হাকী, ইবনে সা'দ ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ বহু সংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে এ ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত করেছেন এবং মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা, সূদ্দী, আবু মালেক, আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম, দাহহাক, আতা ইবনে দীনার এবং আরো অনেক বড় বড় মুফাসসির এ ব্যাখ্যাটাই বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় দলটি قُرْبٰى শব্দটিকে নৈকট্য বা নৈকট্য অর্জন অর্থে গ্রহণ করেন এবং আয়াতটির অর্থ করেছেন, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্যের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া ছাড়া আমি তোমাদের কাছে এ কাজের জন্য আর কোন বিনিময় চাই না। অর্থাৎ তোমরা সংশোধিত হয়ে যাও। শুধু এটাই আমার পুরস্কার। এ ব্যাখ্যা হাসান বাসারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে এবং কাতাদা থেকেও এর সমর্থনে একটি মত বর্ণিত হয়েছে। এমনকি তাবারানীর একটি বর্ণনায় ইবনে আব্বাসের সাথেও এ মতকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। কুরআন মজীদেরও আরেক স্থানে বিষয়টি এ ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَا اَسْـئَلُكُـمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلاً

(الفرقان : ৫৮)–

"এদের বলে দাও, এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। যার ইচ্ছা সে তার রবের পথ অনুসরণ করুক, আমার পারিশ্রমিক শুধু এটাই।"

তৃতীয় দলটি قُرْبٰى শব্দটিকে নিকট আত্মীয় (আত্মীয় স্বজন) অর্থে গ্রহণ করেন। তারা আয়াতের অর্থ করেন ঃ "তোমরা আমার আত্মীয় ও আপনজনদের ভালবাসবে এছাড়া আমার এ কাজের আর কোন পারিশ্রমিক আমি চাই না।" এই দলের কেউ আত্মীয়দের মধ্যে গোটা বনী আবদুল মুত্তালিবকে অন্তর্ভূক্ত করেন আবার কেউ কেউ একে শুধু হযরত

আলী, ফাতেমা ও তাদের সন্তান–সন্ততি পর্যন্ত সীমিত রাখেন। এ ব্যাখ্যাটি সাঈদ ইবনে জুবায়ের এবং 'আমর ইবনে শু'আইব থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আবার কোন কোন বর্ণনাতে একে ইবনে আব্বাস ও হযরত আলী ইবনে হুসাইনের (যয়নুল আবেদীন) সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু কারণে এ ব্যাখ্যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রথমত সন্তানের প্রশ্ন তো দূরের কথা মক্কায় যে সময় এ সূরা শূরা নাযিল হয় সে সময় হযরত আলী ও ফাতিমার বিয়ে পর্যন্ত হয়নি। বনী আবদুল মুত্তালিব গোষ্ঠীরও সবাই আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহযোগিতা করছিলো না। বরং তাদের কেউ কেউ তাঁর প্রকাশ্য দুশমনদের সহযোগী ছিল। এ ক্ষেত্রে আবু লাহাবের শত্রুতার বিষয় তো সর্বজনবিদিত। দ্বিতীয়ত, শুধু বনী আবদুল মুত্তালিব গোষ্ঠীই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয় ছিল না। নবীর (সা) মহিয়সী মা, তাঁর মহান বাপ এবং হযরত খাদীজার (রা) মাধ্যমে কুরাইশদের সকল পরিবারের সাথেই তাঁর আত্মীয়তা ছিল। সেই সব পরিবারে নবীর (সা) গুণী সাহাবা যেমন ছিলেন তেমনি ঘোরতর শত্রুও ছিল। তাই ঐ সব আত্মীয়দের মধ্যে থেকে তিনি কেবল বনী আবদুল মুত্তালিব গোষ্ঠীকে নিজের ঘনিষ্ঠজন আখ্যায়িত করে এই ভালবাসার দাবীকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট রাখবেন তা নবীর (সা) জন্য কি করে সম্ভব ছিল? তৃতীয়ত যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, একজন নবী যে উচ্চাসনে দাঁড়িয়ে সুউচ্চ কন্ঠে আল্লাহর দিকে আহবান জানান সেই উচ্চাসন থেকে এ মহান কাজের জন্য তিনি এত নীচ পর্যায়ের পুরস্কার চাইবেন যে, তোমরা আমার আত্মীয়–স্বজনকে ভালবাসো, তা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এটা এমনই নীচ পর্যায়ের ব্যাপার যে কোন সুস্থ–স্বাভাবিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারে না যে, আল্লাহ তাঁর নবীকে একথা শিখিয়ে থাকবেন আর নবী কুরাইশদের মধ্যে দাঁড়িয়ে একথা বলে থাকবেন। কুরআন মজীদে নবী–রসূলদের যেসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাতে আমরা দেখি একের পর এক নবী এসে তাঁদের কওমকে বলছেন ঃ আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় প্রত্যাশা করি না। আমার পারিশ্রমিক বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর কাছে প্রাপ্য (ইউনুস ৭২, হূদ ২৯ ও ৫১, আশ–শুআরা ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪ ও ১৮০ আয়াত)। সূরা ইয়াসীনে নবীর সত্যতা যাচাইয়ের মানদণ্ড বলা হয়েছে এই যে, তিনি দাওয়াতের ব্যাপারে নিস্বার্থ হন (আয়াত ২১)। কুরআন মজীদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে বার বার একথা বলানো হয়েছে যে, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না (আল আনয়াম ৯০, ইউসুফ ১০৪, আল মু মিনুন ৭২, আল ফুরকান ৫৭, সাবা ৪৭, সোয়াদ ৮৬, আত তূর ৪০, আল কলম ৪৬ আয়াত)। এর পরে একথা বলার কি কোন সুযোগ থাকে যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আহবান জানানোর যে কাজ করছি তার বিনিময়ে তোমরা আত্মীয় স্বজনকে ভালভাসো। তাছাড়া যখন আমরা দেখি, এ ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়নি বরং এখানে সম্বোধন করা হয়েছে কাফেরদেরকে তখন তা আরো খাপছাড়া বলে মনে হয়। আগে থেকেই কাফেরদেরকে লক্ষ্য করেই গোটা বক্তব্য চলে আসছে এবং পরবর্তী বক্তব্যও তাদের লক্ষ্য করেই পেশ করা হয়েছে। বক্তব্যের এই ধারাবাহিকতার মধ্যে বিরোধীদের কাছে কোন রকম বিনিময় চাওয়ার প্রশ্ন কি করে আসতে পারে? বিনিময় চাওয়া যায় তাদের কাছে যাদের কাছে কোন ব্যক্তির তাদের জন্য সম্পাদিত কাজের কোন মূল্য থাকে। কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কাজের কি মূল্য দিচ্ছিলো যে, তিনি তাদের কাছে বলতেন,

আমি তোমাদের জন্য যে কাজ করেছি তার বিনিময়ে তোমরা আমার আত্মীয়–স্বজনদের ভালবাসবে? তারা তো উল্টা সেটাকে অপরাধ মনে করছিলো এবং সে জন্য তাঁকে হত্যা করতে সংকল্পবদ্ধ ছিলো।

৪২. অর্থাৎ যারা জেনে বুঝে নাফরমানী করে সেই সব অপরাধীদের সাথে যে ধরনের আচরণ করা হয় নেক কাজে সচেষ্ট বান্দাদের সাথে আল্লাহর আচরণ তেমন নয়। তাদের সাথে আল্লাহর আচরণ হচ্ছে (১) তারা নিজের পক্ষ থেকে যতটা সৎ কর্মশীল হওয়ার চেষ্টা করে আল্লাহ তাদেরকে তার চেয়েও বেশী সৎ কর্মশীল বানিয়ে দেন (২) তাদের কাজকর্মে যে ত্রুটি–বিচ্যুতি থেকে যায় অথবা সৎকর্মশীল হওয়ার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে গোনাহ সংঘটিত হয় আল্লাহ তা উপেক্ষা করেন এবং (৩) যে সামান্য পরিমাণ নেক কাজের পুঁজি তারা নিয়ে আসে সে জন্য আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদা দেন এবং অধিক পুরস্কার দান করেন।

৪৩. এই প্রশ্নবোধক বাক্যাংশে তীব্র তিরস্কার প্রচ্ছন্ন আছে, যার সারকথা হলো, হে নবী, এসব লোক কি এতই দুঃসাহসী ও নির্ভিক যে তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলার মত ঘৃণিত অপবাদ আরোপ করতে আদৌ লজ্জা অনুভব করলো না? এরা তোমার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে যে তুমি নিজেই এ কুরআন রচনা করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করছো?

৪৪. অর্থাৎ এত বড় মিথ্যা কেবল তারাই বলে যাদের হৃদয়ে মোহর করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাকেও তাদের মধ্যে শামিল করে দেবেন। কিন্তু এটা তাঁর মেহেরবানী যে তিনি তোমাকে এই দল থেকে আলাদা করে রেখেছেন। এই জবাবের মাধ্যমে সেই সব লোকদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এ অপবাদ আরোপ করছিলো। এর তাৎপর্য হচ্ছে ঃ হে নবী, এরা তোমাকেও তাদের মত স্বভাবের মানুষ মনে করে নিয়েছে। এরা যেমন নিজ স্বার্থের জন্য বড় বড় মিথ্যা বলতে কুণ্ঠিত হয় না। তেমনি মনে করে নিয়েছে তুমিও অনুরূপ আপন স্বার্থ হাসিলের জন্য একটি মিথ্যা সাজিয়ে এনেছো। কিন্তু এটা আল্লাহরই মহেরবানী যে তিনি তাদের মত তোমার হৃদয়ে কোন মোহর লাগাননি।

৪৫. অর্থাৎ এটা আল্লাহর নিয়ম যে তিনি বাতিলকে কখনো স্থায়িত্ব দান করেন না এবং পরিশেষে ন্যায় ও সত্যকে ন্যায় ও সত্য হিসেবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। অতএব, হে নবী (সা), তুমি এসব মিথ্যা অপবাদের আদৌ পরোয়া করো না এবং নিজের কাজ করতে থাকো। এমন এক সময় আসবে যখন এসব মিথ্যা ধূলিকণার মত উড়ে যাবে। কিন্তু তুমি যা পেশ করছো তার ন্যায় ও সত্য হওয়া স্পষ্ট হয়ে যাবে।

৪৬. অর্থাৎ তিনি জানেন, তোমার বিরুদ্ধে এসব অপবাদ কেন আরোপ করা হচ্ছে এবং তোমাকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যে চেষ্টা–সাধনা করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তার পেছনে কি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কাজ করছে।

৪৭. পূর্ববর্তী আয়াতের পর পরই তাওবার প্রতি উৎসাহ দান থেকে স্বতই এ বিষয়টি প্রতিভাত হয় যে, হে জালেমেরা সত্য নবীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে নিজেরাই নিজেদেরকে কেন আরো বেশী আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত বানিয়ে নিচ্ছো? এখনো যদি

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

তিনি ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের দোয়া কবুল করেন এবং নিজের দয়ায় তাদের আরো অধিক দেন। কাফেরদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

আল্লাহ যদি তাঁর সব বান্দাদেরকে অঢেল রিযিক দান করতেন তাহলে তারা পৃথিবীতে বিদ্রোহের তুফান সৃষ্টি করতো। কিন্তু তিনি একটি হিসাব অনুসারে যতটা ইচ্ছা নাযিল করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।[৪৮] তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি মানুষদের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং রহমত বিস্তার করে দেন। তিনি প্রশংসার যোগ্য অভিভাবক।[৪৯] এই আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং এ দু' জায়গায় তিনি যেসব প্রাণীকুল ছড়িয়ে রেখেছেন এসব তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।[৫০] যখন ইচ্ছা তিনি এদেরকে একত্র করতে পারেন।[৫১]

নিজেদের এই আচরণ থেকে বিরত থাকো এবং তাওবা করো তাহলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাওবার অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে, যে অপরাধ করেছে বা করে এসেছে তা থেকে বিরত হবে এবং ভবিষ্যতে আর তা করবে না। তাছাড়া সত্যিকার তাওবার অনিবার্য দাবী হচ্ছে কোন ব্যক্তি পূর্বে যে অন্যায় করেছে নিজের সাধ্যমত তার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করবে। যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের কোন উপায় বের করা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং নিজের ওপর যে কলংক লেপন করেছে তা পরিষ্কার করতে থাকবে। তবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য না থাকলে কোন তাওবাই সত্যিকার তাওবা নয়। অন্য কোন কারণে বা উদ্দেশ্যে কোন খারাপ কাজ পরিত্যাগ করা আদৌ তাওবার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।

৪৮. যে প্রসংগে একথা বলা হয়েছে তা সামনে রাখলে স্পষ্ট বুঝা যায়, মক্কার কাফেরদের বিদ্রোহের পেছনে যে কার্যকারণ কাজ করছিলো আল্লাহ এখানে মূলত

وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾ وَمِنْ ءَايَاتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِىٓ ءَايَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٣٥﴾

৪ রুকূ'

তোমাদের ওপর যে মসিবতই এসেছে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে এসেছে। বহু সংখ্যক অপরাধকে তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।[৫২] তোমরা তোমাদের আল্লাহকে পৃথিবীতে অচল ও অক্ষম করে দিতে সক্ষম নও এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন সহযোগী ও সাহায্যকারী নেই। সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মত দৃশ্যমান এসব জাহাজ তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ চাইলে বাতাসকে থামিয়ে দেবেন আর তখন সেগুলো সমুদ্রের বুকে নিশ্চল দাঁড়িয়ে যাবে।—এর মধ্যে সেই সব লোকদের প্রত্যেকের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে যারা পূর্ণ মাত্রায় ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ।[৫৩] অথবা তার আরোহীদের বহু সংখ্যক গোনাহ ক্ষমা করেও তাদেরকে কতিপয় কৃতকর্মের অপরাধে ডুবিয়ে দেবেন। আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে যারা বিতর্ক করে সেই সময় তারা জানতে পারবে, তাদের আশ্রয় লাভের কোন জায়গা নেই।[৫৪]

সেদিকেই ইংগিত করছেন। যদিও রোম ও ইরানের তুলনায় তাদের কোন মর্যাদাশীল অস্তিত্বই ছিল না এবং আশেপাশের জাতিসমূহের মধ্যে তারা একটি পশ্চাদপদ জাতির একটি ব্যবসায়জীবী গোষ্ঠী বা অন্য কথায় ফেরিওয়ালার চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী ছিল না। কিন্তু নিজেদের এই ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে অন্য আরবদের তুলনায় তারা যে সচ্ছলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলো তা তাদেরকে এতটাই অহংকারী করে তুলেছিলো যে, তারা আল্লাহর নবীর কথা শুনতেও কোনভাবে প্রস্তুত ছিল না এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নেতা হবে আর তারা তাঁকে অনুসরণ করবে তাদের গোত্রাধিপতিগণ একে তাদের মার্যাদার পরিপন্থী মনে করতো। এ কারণে বলা হচ্ছে, আমি যদি এসব সংকীর্ণমনা লোকদের জন্য সত্যিই রিযিকের দরজা খুলে দিতাম

তাহলে তারা পুরোপুরি গর্বে ফেটে পড়তো। কিন্তু আমি তাদেরকে আমার পর্যবেক্ষণে রেখেছি এবং বুঝে শুনে ঠিক ততটাই দিচ্ছি যতটা তাদেরকে গর্বে স্ফীত হতে দেবে না। এ অর্থ অনুসারে এ আয়াত ঠিক সেই অর্থ প্রকাশ করছে যা সূরা তাওবার ৬৮ ও ৭০ আয়াত, আল কাহাফের ৩২ ও ৪২ আয়াত, আল কাসাসের ৭৫ ও ৮২ আয়াত, আর রূম ৯ আয়াত, সাবা ৩৪ ও ৩৬ আয়াত এবং আল মু'মিনের ৮২ ও ৮৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৪৯. এখানে অলী অর্থ এমন সত্তা যিনি তাঁর নিজের তৈরী সমস্ত সৃষ্টির সব ব্যাপারের তত্বাবধায়ক, যিনি বান্দাদের সমস্ত অভাব ও প্রয়োজন পূরণের সব দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

৫০. অর্থাৎ যমীন ও আসমান উভয় স্থানেই। জীবনের অস্তিত্ব যে শুধু পৃথিবীতেই নয়, অন্য সব গ্রহেও প্রাণী ও প্রাণধারী সত্তা আছে এটা তার সুস্পষ্ট ইংগিত।

৫১. অর্থাৎ তিনি যেমন তাদের ছড়িয়ে দিতে সক্ষম তেমনি একত্র করতেও সক্ষম। তাই কিয়ামত আসতে পারে না এবং আগের ও পরের সবাইকে একই সময়ে উঠিয়ে একত্রিত করা যেতে পারে না এ ধারণা মিথ্যা।

৫২. প্রকাশ থাকে যে, এখানে মানুষের সব রকম বিপদাপদের কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে না এখানে বক্তব্যের লক্ষ্য সেই সব লোক যারা সেই সময় পবিত্র মক্কায় কুফর ও নাফরমানিতে লিপ্ত হচ্ছিলো। তাদের বলা হচ্ছে, আল্লাহ যদি তোমাদের সমস্ত দোষ–ত্রুটির জন্য পাকড়াও করতেন তাহলে তোমাদেরকে জীবিতই রাখতেন না। তবে যে বিপদাপদ তোমাদের ওপর নাযিল হয়েছে (সম্ভবত মক্কার দুর্ভিক্ষের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে) তা কেবল সতর্কীকরণ হিসেবে দেয়া হয়েছে যাতে তোমাদের সম্বিত ফিরে আসে এবং নিজেদের কাজকর্মের পর্যালোচনা করে দেখো যে, তোমরা আপন রবের বিরুদ্ধে কি ধরনের আচরণ করেছো। একথাও বুঝার চেষ্টা করো, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমরা বিদ্রোহ করছো তাঁর কাছে তোমরা কত অসহায়। তাছাড়া জেনে রাখো, তোমরা যাদেরকে অভিভাবক ও সাহায্যকারী বানিয়ে বসে আছো কিংবা তোমরা যেসব শক্তির ওপর ভরসা করে আছো আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য তারা কোন কাজে আসবে না।

আরো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য এ বিষয়টিও বর্ণনা করা প্রয়োজন যে এ ব্যাপারে খাঁটি মু'মিনের জন্য আল্লাহর বিধান ভিন্ন। মু'মিনের ওপর যে দুঃখ–কষ্ট ও বিপদাপদ আসে তার গোনাহ, ত্রুটি–বিচ্যুতি ও দুর্বলতার কাফফারা হতে থাকে। সহীহ হাদীসে আছে ঃ

مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَهَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ اَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ – (بخارى ، ومسلم)

"মুসলমান যে দুঃখ–কষ্ট, চিন্তা ও দুর্ভাবনা এবং কষ্ট ও অশান্তির সম্মুখীনই হোক না কেন এমন কি একটি কাঁটা বিদ্ধ হলেও আল্লাহ তাকে তার কোন না কোন গোনাহর কাফফারা বানিয়ে দেন।"

فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ
لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ الْإِثْمِ
وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾
وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

যা–ই তোমাদের দেয়া হয়েছে তা কেবল দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপকরণ মাত্র।[৫৫] আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী।[৫৬] তা সেই সব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের ওপর নির্ভর করে,[৫৭] যারা বড় বড় গোনাহ এবং লজ্জাহীনতার কাজ থেকে বিরত থাকে[৫৮] এবং ক্রোধ উৎপত্তি হলে ক্ষমা করে,[৫৯] যারা তাদের রবের নির্দেশ মেনে চলে,[৬০] নামায কায়েম করে এবং নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায়,[৬১] আমি তাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে[৬২] এবং তাদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করা হলে তার মোকাবিলা করে।[৬৩]

এরপর থাকে এমন সব বিপদাপদের প্রশ্ন যা আল্লাহর পথে তাঁর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য কোন ঈমানদারকে বরদাশত করতে হয়, তা কেবল ত্রুটি–বিচ্যুতির কাফফারাই হয় না, আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা বৃদ্ধিরও কারণ হয়। এসব বিপদাপদ গোনাহর শাস্তি হিসেবে নাযিল হয়ে থাকে এমন ধারণা পোষণ করার আদৌ কোন অবকাশ নেই।

৫৩. ধৈর্যশীল অর্থ এমন ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং ভাল মন্দ সব রকম পরিস্থিতিতে বন্দেগীর আচরণের ওপর দৃঢ়পদ থাকে। তাদের অবস্থা এমন নয় যে, সুদিন আসলে নিজের সত্তাকে ভুলে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং বান্দাদের জন্য অত্যাচারী হয়ে ওঠে এবং দুর্দিন আসলে মর্যাদাবোধ খুইয়ে বসে এবং যে কোন জঘন্য থেকে জঘন্যতর আচরণ করতে থাকে। কৃতজ্ঞ বলতে বুঝানো হয়েছে এমন ব্যক্তিকে যাকে তাকদীরে ইলাহী যত উচ্চাসনেই অধিষ্ঠিত করুক না কেন সে তাকে নিজের কৃতিত্ব নয়, বরং আল্লাহর ইহসান মনে করে এবং যত নিচেই তাকে নিক্ষেপ করা হোক না কেন তার দৃষ্টি নিজের বঞ্চনার পরিবর্তে সেই সব নিয়ামতের ওপর নিবদ্ধ থাকে যা অতি করুণ পরিস্থিতির মধ্যেও ব্যক্তি লাভ করে এবং সুখ ও দুঃখ উভয় পরিস্থিতিতে তার মুখ ও অন্তর থেকে তার রবের প্রতি কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পেতে থাকে।

৫৪. কুরাইশদেরকে তাদের বাণিজ্যিক কায়কারবারের উদ্দেশ্যে হাবশা এবং আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে যেতে হতো। এসব সফরে তারা পালের জাহাজ ও নৌকায় লোহিত সাগর পাড়ি দিত যা একটি ভয়ানক সাগর। প্রায়ই তা ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ থাকে এবং তার পানির নীচে বিপুল সংখ্যক পাহাড় বিদ্যমান। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে এসব পাহাড়ের সাথে জাহাজের ধাক্কা খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে আল্লাহ এখানে যে অবস্থা চিত্রিত করেছেন নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে কুরাইশরা তা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারতো।

৫৫. অর্থাৎ এটা এমন কোন জিনিস নয় যার জন্য মানুষ গর্বিত হতে পারে। কোন মানুষ পৃথিবীতে সর্বাধিক সম্পদ লাভ করলেও স্বল্পতম সময়ের জন্যই লাভ করেছে। সে কয়েক বছর মাত্র তা ভোগ করে তারপর সব কিছু ছেড়ে খালি হাতে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যায়। তাছাড়া সে সম্পদ যত অঢেলই হোক না কেন বাস্তবে তার একটা ক্ষুদ্রতম অংশই ব্যক্তির ব্যবহারে আসে। এ ধরনের সম্পদের কারণে গর্বিত হওয়া এমন কোন মানুষের কাজ নয় যে, নিজের এই অর্থ–সম্পদের এবং এই পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে।

৫৬. অর্থাৎ সেই সম্পদ গুণগত ও অবস্থাগত দিক দিয়েও উন্নতমানের। তাছাড়া তা সাময়িক বা অস্থায়ীও নয়, বরং চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর।

৫৭. এখানে আল্লাহর প্রতি ভরসাকে ঈমানের অনিবার্য দাবী এবং আখেরাতের সফলতার জন্য একটি জরুরী বৈশিষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাওয়াক্কুল অর্থ হচ্ছে, প্রথমত, আল্লাহর পথনির্দেশনার ওপর ব্যক্তির পূর্ণ আস্থা থাকবে এবং সে মনে করবে, আল্লাহ প্রকৃত সত্য সম্পর্কে যে জ্ঞান, নৈতিক চরিত্রের যে নীতিমালা, হালাল ও হারামের যে সীমারেখা এবং পৃথিবীতে জীবন যাপনের জন্য যেসব নিয়ম–কানুন ও বিধি–বিধান দিয়েছেন তাই সত্য ও সঠিক এবং সেসব মেনে চলার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত। দ্বিতীয়ত, মানুষের নির্ভরতা তার নিজের শক্তি, যোগ্যতা, মাধ্যম ও উপায়–উপকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের সাহায্য–সহযোগিতার ওপর হবে না। তাকে একথা পুরোপুরি মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিটি ব্যাপারে তার সাফল্য প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্যের ওপর। আর সে আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্যের উপযুক্ত কেবল তখনই হতে পারে যখন সে তাঁর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানিয়ে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখাসমূহ মেনে কাজ করবে। তৃতীয়ত, ঈমান ও নেক কাজের পথ অবলম্বনকারী এবং বাতিলের পরিবর্তে ন্যায় ও সত্যের জন্য কর্মতৎপর বান্দাদেরকে আল্লাহ যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ব্যক্তিকে তার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। ঐ সব প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থাশীল হয়ে সে সেই সব লাভ, উপকার ও আনন্দকে পদাঘাত করবে যা বাতিলের পথ অনুসরণ করার ক্ষেত্রে লাভ করা যাবে বলে মনে হয় এবং ন্যায় ও সত্যের ওপর দৃঢ়পদ থাকার কারণে যেসব ক্ষতি, দুঃখ কষ্ট এবং বঞ্চনা তার ভাগ্যে আসে তা সহ্য করবে। ঈমানের সাথে তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক কত গভীর তা তাওয়াক্কুল শব্দের অর্থের এই বিশ্লেষণের পর সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তাওয়াক্কুল ছাড়া যে ঈমান সাদামাটা স্বীকৃতি ও ঘোষণা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ তা থেকে সেই গৌরবময় ফলাফল কি করে অর্জিত হতে পারে ঈমান গ্রহণ করে তাওয়াক্কুলকারীদের যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে!

৫৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা, টীকা ৫৩, ৫৪; আল আনয়াম, টীকা ১৩০-৩১; আন নাহল, টীকা ৮৯; তাছাড়া সূরা নাজমের ৩২ আয়াত।

৫৯. অর্থাৎ তারা রুক্ষ ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের হয় না, বরং নম্র স্বভাব ও ধীর মেজাজের মানুষ হয়। তাদের স্বভাব প্রতিশোধ পরায়ণ হয় না। তারা আল্লাহর বান্দাদের সাথে ক্ষমার আচরণ করে এবং কোন কারণে ক্রোধান্বিত হলেও তা হজম করে। এটি মানুষের সর্বোত্তম গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মজীদ একে অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য বলে ঘোষণা করেছে (আল ইমরান, আয়াত ১৩৪) এবং একে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাফল্যের বড় বড় কারণসমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে (আল ইমরান, ১৫৯ আয়াত)। হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ

ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فى شىء قط الا ان تنتهك حرمة الله - (بخارى ، مسلم)

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত কারণে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর কোন হুরমত বা মর্যাদার অবমাননা করা হলে তিনি শাস্তি বিধান করতেন।"

৬০. শাব্দিক অনুবাদ হবে "রবের আহবানে সাড়া দেয়।" অর্থাৎ আল্লাহ যে কাজের জন্যই ডাকেন সে কাজের জন্যই ছুটে যায় এবং যে জিনিসের জন্যই আহবান জানান তা গ্রহণ করে।

৬১. এ বিষয়টিকে এখানে ঈমানদারদের সর্বোত্তম গুণাবলীর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে এবং সূরা আল ইমরানে (আয়াত ১৫৯) এ জন্য আদেশ করা হয়েছে। এ কারণে পরামর্শ ইসলামী জীবন প্রণালীর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। পরামর্শ ছাড়া সামষ্টিক কাজ পরিচালনা করা শুধু জাহেলী পন্থাই নয়, আল্লাহর নির্ধারিত বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। ইসলামে পরামর্শকে এই গুরুত্ব কেন দেয়া হয়েছে? এর কারণসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে আমাদের সামনে তিনটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়।

এক ঃ যে বিষয়টি দুই বা আরো বেশী লোকের স্বার্থের সাথে জড়িত সে ক্ষেত্রে কোন এক ব্যক্তির নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তিদের উপেক্ষা করা জুলুম। যৌথ ব্যাপারে কারো যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার নেই। ইনসাফের দাবী হচ্ছে, কোন বিষয়ে যত লোকের স্বার্থ জড়িত সে ব্যাপারে তাদের সবার মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং তাতে যদি বিপুল সংখ্যক লোকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে তাদের আস্থাভাজন প্রতিনিধিদেরকে পরামর্শের মধ্যে শামিল করতে হবে।

দুই ঃ যৌথ ব্যাপারে মানুষ স্বেচ্ছাচারিতা করার চেষ্টা করে অন্যদের অধিকার নস্যাত করে নিজের ব্যক্তি স্বার্থ লাভ করার জন্য, অথবা এর কারণ হয় সে নিজেকে বড় একটা কিছু এবং অন্যদের নগণ্য মনে করে। নৈতিক বিচারে এই দুটি জিনিসই সমপর্যায়ের হীন। মু'মিনের মধ্যে এ দুটির কোনটিই পাওয়া যেতে পারে না। মু'মিন কখনো স্বার্থপর হয় না। তাই সে অন্যদের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করে নিজে অন্যায় ফায়দা চাইতে পারে না

এবং অহংকারী বা আত্মপ্রশংসিতও হতে পারে না যে নিজেকেই শুধু মহাজ্ঞানী ও সবজান্তা মনে করবে।

তিন ঃ যেসব বিষয় অন্যদের অধিকার ও স্বার্থের সাথে জড়িত সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটা বড় দায়িত্ব। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং একথা জানে যে এর জন্য তাকে তার রবের কাছে কত কঠিন জবাবদিহি করতে হবে সে কখনো একা এই গুরুভার নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেয়ার দুঃসাহস করতে পারে না। এ ধরনের দুঃসাহস কেবল তারাই করে যারা আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভিক এবং আখেরাত সম্পর্কে চিন্তাহীন। খোদাভীরু ও আখেরাতের জবাবদিহির অনুভূতি সম্পন্ন লোক কোন যৌথ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কিংবা তাদের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিদেরকে পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই শরীক করার চেষ্টা করবে যাতে সর্বাধিক মাত্রায় সঠিক, নিরপেক্ষ এবং ইনসাফ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এ ক্ষেত্রে যদি অজ্ঞাতসারে কোন ত্রুটি হয়েও যায় তাহলে কোন এক ব্যক্তির ঘাড়ে তার দায়দায়িত্ব এসে পড়বে না।

এ তিনটি কারণ এমন যদি তা নিয়ে মানুষ গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করে তাহলে অতি সহজেই সে একথা উপলব্ধি করতে পারবে যে, ইসলাম যে নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয় পরামর্শ তার অনিবার্য দাবী এবং তা এড়িয়ে চলা একটি অতি বড় চরিত্রহীনতার কাজ। ইসলাম কখনো এ ধরনের কাজের অনুমতি দিতে পারে না। ইসলামী জীবন পদ্ধতি সমাজের ছোট বড় প্রতিটি ব্যাপারেই পরামর্শের নীতি কার্যকরী হোক তা চায়। পারিবারিক ব্যাপার হলে সে ক্ষেত্রে স্বামী–স্ত্রী পরামর্শ করে কাজ করবে এবং ছেলেমেয়ে বড় হলে তাদেরকেও পরামর্শে শরীক করতে হবে। খান্দান বা গোষ্ঠীর ব্যাপার হলে সে ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর সমস্ত বুদ্ধিমান ও বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করতে হবে যদি একটি গোত্র বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী কিংবা জনপদের বিষয়াদি হয় এবং তাতে সব মানুষের অংশগ্রহণ সম্ভব না হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব এমন পঞ্চায়েত বা সভা পালন করবে যেখানে কোন সর্বসম্মত পন্থা অনুসারে সংশ্লিষ্ট সবার আস্থাভাজন প্রতিনিধিরা শরীক হবে। গোটা জাতির ব্যাপার হলে তা পরিচালনার জন্য সবার ইচ্ছানুসারে তাদের নেতা নিযুক্ত হবে জাতীয় বিষয়গুলোকে সে এমন সব ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ অনুসারে পরিচালনা করবে জাতি যাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করে এবং সে ততক্ষণ পর্যন্ত নেতা থাকবে যতক্ষণ জাতি তাকে নেতা বানিয়ে রাখতে চাইবে। কোন ঈমানদার ব্যক্তি জোরপূর্বক জাতির নেতা হওয়ার বা হয়ে থাকার আকাংখা কিংবা চেষ্টা করতে পারে না। প্রথমে জোরপূর্বক জাতির ঘাড়ে চেপে বসা এবং পরে জবরদস্তি করে মানুষের সম্মতি আদায় করা, এমন প্রতারণাও সে করতে পারে না। তাকে পরামর্শ দানের জন্য মানুষ স্বাধীন ইচ্ছানুসারে নিজেদের মনোনীত প্রতিনিধি নয়, বরং এমন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করবে যে তার মর্জি মোতাবেক মতামত প্রকাশ করবে, এমন চক্রান্তও সে করতে পারে না এমন আকাংখা কেবল সেই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে যার মন অসৎ উদ্দেশ্য দ্বারা কলুষিত। এই আকাংখার সাথে أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ এর বাহ্যিক কাঠামো নির্মাণ এবং তার বাস্তব প্রাণসত্তাকে নিঃশেষ করে দেয়ার প্রচেষ্টা শুধু সেই ব্যক্তিই চালাতে পারে যে আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টিকে ধোঁকা দিতে ভয় করে না। অথচ না আল্লাহকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব না আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ এমন অন্ধ হতে পারে যে, প্রকাশ্য দিবালোকে কেউ ডাকাতি করছে আর মানুষ তা দেখে সরল মনে ভাবতে থাকবে যে, সে ডাকাত নয়, মানুষের সেবা করছে।

أَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ এর নিয়মটি প্রকৃতি ও বৈশিষ্টের দিক দিয়ে পাঁচটি জিনিস দাবী করে ঃ

এক ঃ যৌথ বিষয়সমূহ যাদের অধিকার ও স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত তাদের মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে এবং কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারগুলো কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে বিষয়ে তাদের অবহিত রাখতে হবে। তারা যদি তাদের ব্যাপারগুলোর নেতৃত্বে কোন ত্রুটি, অপরিপক্কতা বা দুর্বলতা দেখায় তাহলে তা তুলে ধরার ও তার প্রতিবাদ করার এবং সংশোধিত হতে না দেখলে পরিচালক ও ব্যবস্থাপকদের পরিবর্তন করার অধিকার থাকতে হবে। মানুষের মুখ বন্ধ করে, হাত পা বেঁধে এবং তাদেরকে অনবহিত রেখে তাদের সামষ্টিক ব্যাপারসমূহ পরিচালনা করা সুস্পষ্ট প্রবঞ্চনা। কেউ–ই এ কাজকে أَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ নীতির অনুসরণ বলে মানতে পারে না।

দুই ঃ যৌথ বিষয়সমূহ পরিচালনার দায়িত্ব যাকেই দেয়া হবে তাকে যেন এ দায়িত্ব সবার স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে দান করা হয়। জবরদস্তি ও ভয়ভীতি দ্বারা অর্জিত কিংবা লোভ–লালসা দিয়ে খরিদকৃত অথবা ধোঁকা–প্রতারণা ও চক্রান্তের মাধ্যমে লুণ্ঠিত সম্মতি প্রকৃতপক্ষে কোন সম্মতি নয়। যে সম্ভাব্য সব রকম পন্থা কাজে লাগিয়ে কোন জাতির নেতা হয় সে সত্যিকার নেতা নয়। সত্যিকার নেতা সেই যাকে মানুষ নিজের পসন্দানুসারে সানন্দ চিত্তে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে।

তিন ঃ নেতাকে পরামর্শ দানের জন্যও এমন সব লোক নিয়োগ করতে হবে যাদের প্রতি জাতির আস্থা আছে। এটা সর্বজনবিদিত যে, যারা চাপ সৃষ্টি করে কিংবা অর্থ দ্বারা খরিদ করে অথবা মিথ্যা ও চক্রান্তের সাহায্যে বা মানুষকে বিভ্রান্ত করে প্রতিনিধিত্বের স্থানটি দখল করে তাদেরকে সঠিক অর্থে আস্থাভাজন বলা যায় না।

চার ঃ পরামর্শদাতাগণ নিজেদের জ্ঞান, ঈমান ও বিবেক অনুসারে পরামর্শ দান করবে এবং এভাবে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে। এ দিকগুলো যেখানে থাকবে না, যেখানে পরামর্শদাতা কোন প্রকার লোভ–লালসা বা ভীতির কারণে অথবা কোন দলাদলির মারপ্যাঁচের কারণে নিজের জ্ঞান ও বিবেকের বিরুদ্ধে মতামত পেশ করে সেখানে প্রকৃতপক্ষে হবে খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা أَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ এর অনুসরণ নয়।

পাঁচ ঃ পরামর্শদাতাদের 'ইজমা'র (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) ভিত্তিতে যে পরামর্শ দেয়া হবে, অথবা যে সিদ্ধান্ত তাদের অধিকাংশের সমর্থন লাভ করবে তা মেনে নিতে হবে। কেননা সবার মতামত জানার পরও যদি এক ব্যক্তি অথবা একটি ছোট্ট গ্রুপকে স্বেচ্ছাচার চালানোর সুযোগ দেয়া হয় তাহলে পরামর্শ অর্থহীন হয়ে যায়। আল্লাহ একথা বলছেন না যে, "তাদের ব্যাপারে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়" বরং বলছেন, 'তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে চলে।" শুধু পরামর্শ করাতেই এ নির্দেশ পালন করা হয় না। তাই পরামর্শের ক্ষেত্রে সর্বসম্মত অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজকর্ম পরিচালনা প্রয়োজন।

ইসলামের পরামর্শ ভিত্তিক কাজ পরিচালনা নীতির এই ব্যাখ্যার সাথে এই মৌলিক কথাটার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মুসলমানদের পারস্পরিক বিষয়সমূহ পরিচালনায়

এই শূরা স্বেচ্ছাচারী এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নয়, বরং অবশ্যই সেই দীনের বিধি–বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ আল্লাহ নিজেই যার জন্য বিধান রচনা করেছেন। সাথে সাথে তা সেই মূল নীতিরও আনুগত্য করতে বাধ্য যাতে বলা হয়েছে "যে ব্যাপারেই তোমাদের মধ্যে মতভেদ হবে তার ফায়সালা করবেন আল্লাহ।" এবং "তোমাদের মধ্যে যে বিরোধই বাধুক না কেন সে জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে ফিরে যাও।" এই সাধারণ সূত্র অনুসারে মুসলমানরা শারয়ী বিষয়ে মূল ধর্মগ্রন্থের কোন অংশের কি অর্থ এবং কিভাবে তা কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করতে পারে যাতে তার মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয়। কিন্তু যে ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সে ব্যাপারে তারা নিজেরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এ উদ্দেশ্যে কোন পরামর্শ করতে পারে না।

৬২. এর তিনটি অর্থ ঃ

এক ঃ আমি তাদেরকে যে হালাল রিযিক দান করেছি তা থেকে খরচ করে, নিজের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য হারাম অর্থ–সম্পদের দিকে হাত বাড়ায় না।

দুই ঃ আমার দেয়া রিযিককে যক্ষের ধনের মত জমা করে রাখে না, বরং খরচ করে।

তিন ঃ তাদের যে রিযিক দেয়া হয়েছে তা থেকে আল্লাহর পথেও ব্যয় করে, সবটাই নিজের জন্য আঁকড়ে ধরে রাখে না।

প্রথম অর্থের ভিত্তি হলো, আল্লাহ শুধু হালাল ও পবিত্র রিযিককেই তাঁর দেয়া রিযিক বলে বর্ণনা করেন। অপবিত্র ও হারাম পন্থায় উপার্জিত রিযিককে তিনি তাঁর নিজের দেয়া রিযিক বলেন না। দ্বিতীয় অর্থের ভিত্তি হলো, আল্লাহ মানুষকে যে রিযিক দান করেন তা খরচ করার জন্য দান করেন, জমিয়ে জমিয়ে সাপের মত পাহারা দিয়ে রাখার জন্য দেন না। এবং তৃতীয় অর্থের ভিত্তি হলো, কুরআন মজীদে ব্যয় করা বলতে শুধু নিজের সত্তা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যয় করা বুঝানো হয়নি। এ অর্থের মধ্যে আল্লাহর পথে ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত। এ তিনটি কারণে আল্লাহ এখানে খরচ করাকে ঈমানদারদের সর্বোত্তম গুণাবলীর মধ্যে গণ্য করছেন এবং এ জন্য আখেরাতের কল্যাণসমূহ তাদের জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৬৩. এটাও ঈমানদারদের একটা সর্বোৎকৃষ্ট গুণ। তারা জালেম ও নিষ্ঠুরদের জন্য সহজ শিকার নয়। তাদের কোমল স্বভাব এবং ক্ষমাশীলতা দুর্বলতার কারণে নয়। তাদের ভিক্ষু ও পাদরীদের মত মিসকীন হয়ে থাকার শিক্ষা দেয়া হয়নি। তাদের ভদ্রতার দাবী হচ্ছে বিজয়ী হলে বিজিতের দোষ–ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়। সক্ষম হলে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে মাফ করে এবং অধীনস্ত ও দুর্বল ব্যক্তির দ্বারা কোন ভুল–ত্রুটি সংঘটিত হলে তা উপেক্ষা করে যায়। কিন্তু কোন শক্তিশালী ব্যক্তি যদি তার শক্তির অহংকারে তার প্রতি বাড়াবাড়ি করে তাহলে বুক টান করে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাকে উচিত শিক্ষা দান করে। মু'মিন কখনো জালেমের কাছে হার মানে না এবং অহংকারীর সামনে মাথা নত করে না। এ ধরনের লোকদের জন্য তারা বড় কঠিন খাদ্য যা চিবানোর প্রচেষ্টাকারীর মাড়িই ভেঙে দেয়।

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ
لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ
سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ
فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ
وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٣﴾

খারাপের[৬৪] প্রতিদান সমপর্যায়ের খারাপ।[৬৫] অতপর যে মাফ করে দেয় এবং সংশোধন করে তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর দায়িত্ব।[৬৬] আল্লাহ জালেমদের পসন্দ করেন না।[৬৭] যারা জুলুম হওয়ার পরে প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের তিরস্কার করা যায় না। তিরস্কারের উপযুক্ত তো তারা যারা অন্যদের ওপর জুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায় বাড়াবাড়ি করে। এসব লোকের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। তবে যে ধৈর্যের সাথে কাজ করে এবং ক্ষমা প্রদর্শন করে তার সে কাজ মহত্তর সংকল্পদীপ্ত কাজের অন্তর্ভুক্ত।[৬৮]

৬৪. এখান থেকে শেষ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত গোটা বক্তব্য পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

৬৫. এটা প্রথম নিয়মতান্ত্রিক বিধান, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে যা মনে রাখা দরকার। প্রতিশোধ গ্রহণের বৈধ সীমা হচ্ছে কারো প্রতি যতটুকুন অন্যায় করা হয়েছে সে তার প্রতি ঠিক ততটুকুন অন্যায় করবে। তার চেয়ে বেশী অন্যায় করার অধিকার তার নেই।

৬৬. এটা প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বিতীয় বিধান। এর অর্থ অন্যায়কারী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ যদিও বৈধ, তবে যেখানে ক্ষমা করে দিলে তা সংশোধনের কারণ হতে পারে সেখানে সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে মাফ করে দেয়া অধিক উত্তম। যেহেতু মানুষ নিজেকে কষ্ট দিয়ে এই ক্ষমা প্রদর্শন করে তাই আল্লাহ বলেন, এর প্রতিদান দেয়া আমার দায়িত্ব। কারণ, সত্য পথ থেকে বিচ্যুত মানুষকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তুমি এই তিক্ততা হজম করেছো।

৬৭. এই সতর্ক বাণীর মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ সম্পর্কে তৃতীয় আরেকটি বিধানের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে, অন্যের কৃত জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে করতে কোন ব্যক্তির নিজেরই জালেম না হয়ে যাওয়া উচিত। একটি অন্যায়ের পরিবর্তে তার চেয়ে বড় অন্যায় করে ফেলা বৈধ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেউ অপর কাউকে একটি চপেটাঘাত করে তাহলে সে তাকে একটি চপেটাঘাতই করতে পারে, অসংখ্য লাথি ও ঘুঁষি মারতে পারে না। অনুরূপ গোনাহর, প্রতিশোধ গোনাহর কাজের মাধ্যমে নেয়া ঠিক

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا
الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿۴۴﴾ وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ
عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْۤا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ
اَلَاۤ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿۴۵﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ
يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿۴۶﴾

৫ রুকূ'

আল্লাহ নিজেই যাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন আল্লাহ ছাড়া তাকে সামলানোর আর কেউ নেই।[৬৯] তোমরা দেখতে পাবে এসব জালেমরা যখন আযাব দেখবে তখন বলবে এখন কি ফিরে যাবারও কোন পথ আছে?[৭০] তুমি দেখতে পাবে এদের জাহান্নামের সামনে আনা হলে অপমানে আনত হতে থাকবে এবং দৃষ্টির আড়ালে বাঁকা চোখে তাকে দেখতে থাকবে।[৭১] যারা ঈমান এনেছিলো সেই সময় তারা বলবে ঃ প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা আজ কিয়ামতের দিন নিজেরাই নিজেদেরকে এবং নিজেদের সংশ্লিষ্টদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। সাবধান! জালেমরা চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করতে থাকবে এবং তাদের কোন সহযোগী ও অভিভাবক থাকবে না, যারা আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের সাহায্য করবে। আল্লাহ নিজেই যাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন তার বাঁচার কোন পথ নেই।

নয়। যেমন কোন জালেম যদি কারোর পুত্রকে হত্যা করে তাহলে তার পুত্রকে হত্যা করা জায়েয নয়। কিংবা কোন দুরাচার যদি কারো বোন বা কন্যার সাথে ব্যভিচার করে তাহলে সেই ব্যক্তির তার বোন বা কন্যার সাথে ব্যভিচার করা হালাল হবে না।

৬৮. উল্লেখ্য, এ আয়াতগুলোতে ঈমানদারদের যেসব গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তা সেই সময় বাস্তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের জীবনে বিদ্যমান ছিল এবং মক্কার কাফেররা নিজ চোখে তা দেখছিলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এভাবে কাফেরদের বুঝিয়েছেন যে, পৃথিবীর স্বল্প দিনের জীবন যাপনের যে উপায়–উপকরণ লাভ করে তোমরা আত্মহারা হয়ে পড়ছো প্রকৃত সম্পদ ঐ সব

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ط مَا لَكُمْ
مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿٤٧﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ط اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ط وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا
رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ج وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ
الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٨﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط
يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿٤٩﴾ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ
ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾

তোমরা তোমাদের রবের কথায় সাড়া দাও—সেই দিনটি আসার আগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে ফিরিয়ে দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।[৭২] সেই দিন তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টাকারীও কেউ থাকবে না।[৭৩] এখন যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে হে নবী, আমি তো আপনাকে তাদের জন্য রক্ষক হিসেবে পাঠাইনি।[৭৪] কথা পৌছিয়ে দেয়াই কেবল তোমার দায়িত্ব। মানুষের অবস্থা এই যে, যখন আমি তাকে আমার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন সে তার জন্য গর্বিত হয়ে ওঠে। আর যখন তার নিজ হাতে কৃত কোন কিছু মুসিবত আকারে তার ওপর আপতিত হয় তখন সে চরম অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।[৭৫]

যমীন ও আসমানের বাদশাহীর অধিকর্তা আল্লাহ[৭৬] তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়টিই দেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছু করতে সক্ষম।[৭৭]

উপায়–উপকরণ নয়। বরং কুরআনের পথনির্দেশনা গ্রহণ করে তোমাদের সমাজের এসব ঈমানদার তাদের মধ্যে যে নৈতিক চরিত্র ও গুণাবলী সৃষ্টি করেছে। সেগুলোই প্রকৃত সম্পদ।

৬৯. অর্থাৎ আল্লাহ এসব লোকের হিদায়াতের জন্য কুরআনের মত সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব পাঠিয়েছেন, যা অত্যন্ত যুক্তিসংগত এবং অত্যন্ত কার্যকর ও চিত্তাকর্ষক উপায়ে প্রকৃত

সত্যের জ্ঞান দান করছে এবং জীবনের সঠিক পথ বলে দিচ্ছে। তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত নবী পাঠিয়েছেন যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীবন ও চরিত্রের অধিকারী মানুষ তাদের দৃষ্টি কখনো দেখেনি। আল্লাহ এই কিতাব ও এই রসূলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুফলসমূহও ঈমান গ্রহণকারীদেরকে তাদের নিজ চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন। এসব দেখার পর যদি কোন ব্যক্তি হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ পুনরায় তাকে সেই গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করবেন যেখান থেকে সে বেরিয়ে আসতে আগ্রহী নয়। আর আল্লাহই যখন তাকে তাঁর দরজা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেন তখন তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব কে নিতে পারে?

৭০. অর্থাৎ আজ যখন ফিরে আসার সুযোগ আছে তখন এরা ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। কিন্তু কাল যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে এবং শাস্তির নির্দেশ কার্যকর হবে তখন নিজেদের দুর্ভাগ্য দেখে এরা ফিরে আসার সুযোগ পেতে চাইবে।

৭১. মানুষের স্বভাব হচ্ছে, কোন ভয়ানক দৃশ্য যখন তার সামনে থাকে এবং সে বুঝতে পারে, চোখের সামনে যা দেখা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই সে তার কবলে পড়তে যাচ্ছে তখন প্রথমেই ভয়ের চোটে চোখ বন্ধ করে নেয়। এরপরও যদি তার হাত থেকে রেহাই না পায় তখন দেখার চেষ্টা করে বিপদটা কেমন এবং এখনো তার থেকে কত দূরে আছে। কিন্তু মাথা উঁচু করে ভালভাবে দেখার হিম্মত তার থাকে না। তাই সে বার বার একটু একটু করে চোখ খুলে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখে এবং ভয়ের চোটে আবার চোখ বন্ধ করে নেয়। এ আয়াতে জাহান্নামের দিকে অগ্রসরমান লোকদের এই অবস্থাই এখানে চিত্রিত করা হয়েছে।

৭২. অর্থাৎ না আল্লাহ নিজে তা ফিরাবেন আর না অন্য কারো তা ফিরানোর ক্ষমতা আছে।

৭৩. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে مَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ এই আয়াতাংশের আরো কয়েকটি অর্থ আছে। এক—তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের কোনটিকেই অস্বীকার করতে পারবে না। দুই—তোমরা পোশাক বদল করে কোথাও লুকাতে পারবে না। তিন—তোমাদের সাথে যে আচরণই করা হোক না কেন তোমরা তার কোন প্রতিবাদ এবং তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারবে না। চার—তোমাদেরকে যে পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে তোমরা তা পাল্টিয়ে ফেলতে পারবে না।

৭৪. অর্থাৎ তোমাদের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি যে, তোমরা অবশ্যই তাদেরকে সঠিক পথে আনবে অন্যথায় তারা সঠিক পথে আসেনি কেন সে জন্য তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

৭৫. মানুষ বলতে এখানে সেই নীচমনা ও অদূরদর্শী মানুষদের বুঝানো হয়েছে পূর্ব থেকেই যাদের আলোচনা চলে আসছে। পার্থিব কিছু সম্পদ লাভ করার কারণে যারা গর্বিত হয়ে উঠেছে এবং বুঝিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করা হলে সেদিকে কানই দেয় না কিন্তু নিজেদের কৃতকর্মের কারণেই যদি কোন সময় তাদের দুর্ভাগ্য এসে যায় তাহলে ভাগ্যকে দোষারোপ করতে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন তা সবই ভুলে যায় এবং যে অবস্থার মধ্যে সে পতিত হয়েছে তাতে তার নিজের দোষ-ত্রুটি কতটুকু তা

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ إِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٥١﴾ وَكَذٰلِكَ
أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا
الْإِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ
وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ؕ أَلَآ إِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْأُمُوْرُ ﴿٥٣﴾

কোন[৭৮] মানুষই এ মর্যাদার অধিকারী নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। তিনি কথা বলেন হয় অহীর (ইংগিত) মাধ্যমে,[৭৯] অথবা পর্দার আড়াল থেকে,[৮০] কিংবা তিনি কোন বার্তাবাহক (ফেরেশতা) পাঠান এবং সে তাঁর হুকুমে তিনি যা চান অহী হিসেবে দেয়।[৮১] তিনি সুমহান ও সুবিজ্ঞ।[৮২] এভাবেই (হে মুহাম্মদ), আমি আমার নির্দেশে তোমার কাছে এক রূহকে অহী করেছি।[৮৩] তুমি আদৌ জানতে না কিতাব কি এবং ঈমানই বা কি।[৮৪] কিন্তু সেই রূহকে আমি একটি আলো বানিয়ে দিয়েছি যা দিয়ে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ দেখিয়ে থাকি। নিশ্চিতভাবেই আমি তোমাকে সোজা পথের দিক নির্দেশনা দান করছি। সেই আল্লাহর পথের দিকে যিনি যমীন ও আসমানের সব জিনিসের মালিক। সাবধান, সব কিছু আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়।[৮৫]

বুঝার চেষ্টা করে না। এভাবে না স্বাচ্ছন্দ্য তাদের সংশোধনে কাজে আসে না দুরবস্থা তাদেরকে শিক্ষা দিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারে। বক্তব্যের ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল পূর্বোক্ত বক্তব্যের শ্রোতাদের প্রতি একটি বিদ্রূপ। তবে তাদের সম্বোধন করে একথা বলা হয়নি যে, তোমাদের অবস্থা তো এই। বরং বলা হয়েছে, সাধারণত মানুষের মধ্যে এই দুর্বলতা দেখা যায় এবং এটাই তার নষ্টের মূল কারণ। এ থেকে ইসলামের প্রচার কৌশলের একটি দিক এই জানা যায় যে, শ্রোতার দুর্বলতার ওপর সরাসরি আঘাত না করা উচিত। সাধারণভাবে এসব দুর্বলতার উল্লেখ করা উচিত যাতে সে ক্ষিপ্ত না হয় এবং তার বিবেকবোধ যদি কিঞ্চিতও জীবিত থাকে তাহলে ঠাণ্ডা মাথায় নিজের ত্রুটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করে।

৭৬. অর্থাৎ যারা কুফর ও শিরকের নির্বুদ্ধিতায় ডুবে আছে তারা যদি বুঝানোর পরও না মানতে চায় না মানুক, সত্য যথা স্থানে সত্যই। যমীন ও আসমানের বাদশাহী দুনিয়ার

তথাকথিত বাদশাহ, স্বৈরাচারী ও নেতাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি। কোন নবী, অলী, দেবী বা দেবতার তাতে কোন অংশ নেই, আল্লাহ একাই তার মালিক। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী না নিজের শক্তিতে বিজয়ী হতে পারে, না সেই সব সত্তার কেউ এসে তাকে রক্ষা করতে পারে যাদেরকে মানুষ নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে খোদায়ী ক্ষমতা ও এখতিয়ারসমূহের মালিক মনে করে বসে আছে।

৭৭. এটা আল্লাহর বাদশাহীর নিরংকুশ (Absolute) হওয়ার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। কোন মানুষ, সে পার্থিব ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যত বড় অধিকর্তাই সাজুক না কেন, কিংবা তাকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যত বড় মালিকই মনে করা হোক না কেন, অন্যদের সন্তান দেওয়ানো তো দূরের কথা নিজের জন্য নিজের ইচ্ছানুসারে সন্তান জন্ম দানেও সে কখনো সক্ষম হয়নি। আল্লাহ যাকে বন্ধ্যা করে দিয়েছেন সে কোন ওষুধ, কোন চিকিৎসা এবং কোন তাবীজ কবজ দ্বারা সন্তান ওয়ালা হতে পারেনি। আল্লাহ যাকে শুধু কন্যা সন্তান দান করেছেন সে কোনভাবেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করতে পারেনি এবং আল্লাহ যাকে শুধু পুত্র সন্তানই দিয়েছেন সে কোনভাবেই একটি কন্যা সন্তান লাভ করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে সবাই নিদারুণ অসহায় এমনকি সন্তান জন্মের পূর্বে কেউ এতটুকু পর্যন্ত জানতে পারেনি যে মায়ের গর্ভে পুত্র সন্তান বেড়ে উঠছে না কন্যা সন্তান। এসব দেখে শুনেও যদি কেউ খোদার খোদায়ীতে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী সেজে বসে, কিংবা অন্য কাউকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে অংশীদার মনে করে তাহলে সেটা তার নিজের অদূরদর্শিতা যার পরিণাম সে নিজেই ভোগ করবে। কেউ নিজে নিজেই কোন কিছু বিশ্বাস করে বসলে তাতে প্রকৃত সত্যে সামান্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না।

৭৮. বক্তব্যের সূচনা পর্বে যা বলা হয়েছিলো সমাপ্তি পর্যায়েও সেই বিষয়টিই বলা হচ্ছে। কথাটা পুরোপুরি বুঝতে হলে এই সূরার প্রথম আয়াত এবং তার টীকা পুনরায় দেখে নিন।

৭৯. এখানে অহী অর্থ 'ইলকা', ইলহাম, মনের মধ্যে কোন কথা সৃষ্টি করে দেয়া কিংবা স্বপ্নে কিছু দেখিয়ে দেয়া, যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইউসুফকে দেখানো হয়েছিলো (ইউসুফ, আয়াত ৪ ও ১০০ এবং আস সাফফাত, ১০২)।

৮০. এর সারমর্ম হচ্ছে, বান্দা শব্দ শুনতে পায় কিন্তু শব্দদাতাকে দেখতে পায় না, যেমন হযরত মূসার ক্ষেত্রে ঘটেছিলো। তূর পাহাড়ের পাদদেশে একটি বৃক্ষ থেকে হঠাৎ আওয়াজ আসতে শুরু হলো। কিন্তু যিনি কথা বললেন তিনি তার দৃষ্টির আড়ালেই থাকলেন (ত্বাহা, আয়াত ১১ থেকে ৪৮; আন নামল, আয়াত ৮ থেকে ১২; আল কাসাস, আয়াত ৩০ থেকে ৩৫)।

৮১. যে পদ্ধতিতে নবী–রসূলদের কাছে সমস্ত আসমানী কিতাব এসেছে এটা অহী আসার সেই পদ্ধতি। কেউ কেউ এ আয়াতাংশের ভুল ব্যাখ্যা করে এর অর্থ করেছেন ঃ আল্লাহ রসূল প্রেরণ করেন যিনি তাঁর নির্দেশে সাধারণ লোকদের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছিয়ে দেন।" কিন্তু কুরআনের ভাষা فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ (তারপর সে তাঁর নির্দেশে তিনি যা চান তাই অহী হিসেবে দেয়) তাদের এই ব্যাখ্যার ভ্রান্তি সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দেয়। সাধারণ মানুষের সামনে নবীদের তাবলীগী কাজকর্মকে "অহী প্রদান" অর্থে না কুরআনের

কোথাও আখ্যায়িত করা হয়েছে, না আরবী ভাষায় মানুষের সাথে মানুষের কথাবার্তাকে 'অহী' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করার কোন অবকাশ আছে। অহীর আভিধানিক অর্থই হচ্ছে গোপন এবং ত্বরিত ইংগিত। নবী-রসূলদের তাবলীগি কাজকর্ম বুঝাতে এই শব্দটির ব্যবহার শুধু এমন ব্যক্তিই করতে পারে যে আরবী ভাষায় একেবারেই অজ্ঞ।

৮২. অর্থাৎ তিনি কোন মানুষের সাথে সামনা-সামনি কথাবার্তা বলার বহু উর্ধে। নিজের কোন বান্দার কাছে নির্দেশনা পৌছিয়ে দেয়ার জন্য সামনা সামনি বাক্যালাপ করা ছাড়া আর কোন কৌশল উদ্ভাবন করতে তাঁর জ্ঞান অক্ষম নয়।

৮৩. "এভাবেই" অর্থ শুধু শেষ পদ্ধতি নয়, বরং ওপরের আয়াতে যে তিনটি পদ্ধতি উল্লেখিত হয়েছে তার সব কটি। আর 'রূহ' অর্থ অহী অথবা অহীর মাধ্যমে নবীকে (সা) যে শিক্ষা দান করা হয়েছে সেই শিক্ষা। কুরআন ও হাদীস থেকেই একথা প্রমাণিত যে, এই তিনটি পদ্ধতিতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত দান করা হয়েছে ঃ

এক ঃ হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী আসার সূচনা হয়েছিলো সত্য স্বপ্নের আকারে (বুখারী ও মুসলিম)। এই ধারা পরবর্তী সময় পর্যন্ত জারি ছিল। তাই হাদীসে তাঁর বহু সংখ্যক স্বপ্নের উল্লেখ দেখা যায়। যার মাধ্যমে হয় তাঁকে কোন শিক্ষা দেয়া হয়েছে কিংবা কোন বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। তাছাড়া কুরআন মজীদে নবীর (সা) একটি স্বপ্নের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে (আল ফাতহ, আয়াত ২৭)। তাছাড়া কতিপয় হাদীসে একথারও উল্লেখ আছে যে, নবী (সা) বলেছেন, আমার মনে অমুক বিষয়টি সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, কিংবা আমাকে একথাটি বলা হয়েছে বা আমাকে এই নির্দেশ দান করা হয়েছে অথবা আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ ধরনের সব কিছু অহীর প্রথমোক্ত শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত। বেশীর ভাগ হাদীসে কুদসী এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।

দুই ঃ মে'রাজে নবীকে (সা) দ্বিতীয় প্রকার অহী দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। কতিপয় হাদীসে নবীকে (সা) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ দেয়া এবং তা নিয়ে তাঁর বার বার দরখাস্ত পেশ করার কথা যেভাবে উল্লেখিত হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সে সময় আল্লাহ এবং তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ঠিক তেমনি কথাবার্তা হয়েছিলো যেমনটি তূর পাহাড়ের পাদদেশে মূসা (আ) ও আল্লাহর মধ্যে হয়েছিলো।

তিন ঃ এরপর থাকে অহীর তৃতীয় শ্রেণী। এ ব্যাপারে কুরআন নিজেই সাক্ষ্য দান করে যে, কুরআনকে জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছানো হয়েছে (আল বাকারা ৯৭, আশ শু'আরা ১৯২ থেকে ১৯৫ আয়াত)।

৮৪. অর্থাৎ নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার আগে নবীর (সা) মগজে এ ধারণা পর্যন্তও কোন দিন আসেনি যে, তিনি কোন কিতাব লাভ করতে যাচ্ছেন বা তাঁর লাভ করা উচিত। বরং তিনি আসমানী কিতাব এবং তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আদৌ কিছু জানতেন না। অনুরূপ আল্লাহর প্রতি তাঁর ঈমান অবশ্যই ছিল। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে কি কি বিষয় মানতে হবে সচেতনভাবে তিনি তার বিস্তারিত কিছুই জানতেন না। একথাও তাঁর

জানা ছিল না যে, এর সাথে ফেরেশতা, নবুওয়াত, আল্লাহর কিতাবসমূহ এবং আখেরাত সম্পর্কে অনেক কিছুই মানা আবশ্যক। এ দুটি ছিল এমনই বিষয় যা মক্কার কাফেরদের কাছেও গোপন ছিল না। মক্কার কোন মানুষই এ প্রমাণ দিতে সক্ষম ছিল না যে, হঠাৎ নবুওয়াত ঘোষণার পূর্বে সে কখনো নবীর (সা) মুখে আল্লাহর কিতাবের কথা শুনেছে কিংবা মানুষদের অমুক অমুক বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে এমন কোন কথা শুনেছে। একথা সুস্পষ্ট যদি কোন ব্যক্তি পূর্ব থেকেই নবী হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে তাহলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত রাত দিন তার সাথে উঠাবসা করেও কেউ তার মুখ থেকে কিতাব ও ঈমান শব্দ পর্যন্ত শুনবে না। অথচ চল্লিশ বছর পর সে ঐ সব বিষয়েই হঠাৎ জোরালো বক্তব্য পেশ করতে শুরু করবে তা কখনো হতে পারে না।

৮৫. এটা কাফেরদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত শেষ সতর্কবাণী। এর তাৎপর্য হলো, নবী (সা) বললেন আর তোমরা তা শুনে প্রত্যাখ্যান করলে কথা এখানেই শেষ হয়ে যাবে না। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তার সবই আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে এবং সবশেষে কার কি পরিণাম হবে সে চূড়ান্ত ফায়সালা তার দরবার থেকেই হবে।